পায়ের তলার মাটির মত অন্তরঙ্গ, আকাশের দুর্নিরীক্ষ্য তারকার মত রহস্যময় এবং বিজ্ঞানসম্মত স্বকীয় বিশেষ ভাবনা এই তিন মিলে সন্তোষকুমার ঘোষ। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে সন্তোষকুমার এক নতুন যুগের ভূমিকা। কী ভাষা, কী বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং মনোবিশ্লেষণের গভীরতায় এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী অনন্য সৃষ্টি কৌশলের প্রবর্তক।

'দুই কাননের পাখি' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; যার প্রতিটি রচনা প্রেমে নমনীয়, বৈচিত্রে বিশিষ্ট, ভাষায় সুললিত এবং শিল্পরীতিতে আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম।

দুই
কাননের
পাখি

দুই
কাননের
পাখি

সন্তোষকুমার ঘোষ

পরিবেশক

কারেণ্ট বুক সপ

৫৭এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, জ্যৈষ্ঠ '৬৬

প্রকাশিকা। নূপুর ধারা, ৭, রাম হরি ঘোষ লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদসজ্জা। শ্রীশ্যামল সেন

মুদ্রাকর। শ্রীঅবনীরঞ্জন মান্না
নিউ মহামায়া প্রেস, ৬৫।৭, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-১২

দাম—২'৫০

নীহারকে

[এক পক্ষ]

"হুজুর ধর্মাবতার, আমার মক্কেল শ্রীমতী করবী রায়ের বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত মঞ্জুর করতে আজ্ঞা হয়।

"আবেদনকারিণীর বয়স সাতাশ বছর, তিন মাস, ষোল দিন। জন্ম খিদিরপুরে। পিতা মৃত রজনীকান্ত রায়। বর্তমান ঠিকানা ষাট নম্বর শ্রীমন্ত মল্লিক স্ট্রীট, কলিকাতা পনের। আবেদনকারিণী একজন পাশকরা নার্স। কিছুদিন একটি মিশনারী হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে করুণাময়ী নার্সিং হোমে যোগ দেন। ঠিক এখন অবশ্য তিনি কোন হোম বা হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত নন।

"ঠিক এক বছর চার মাস পূর্বে উল্লিখিত নার্সিং হোমের ডাক্তার সুভদ্র রায়ের (যাঁকে অতঃপর প্রতিবাদী বা অপর পক্ষ বলে উল্লেখ করা হবে) সঙ্গে আবেদনকারিণীর বিবাহ হয়। সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট অনুসারে এই বিবাহ সিদ্ধ এবং সরকারী ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের উপস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ফর্ম ইত্যাদি স্বাক্ষরিত হয় (একজিবিট নং এক)। অনুষ্ঠানে তিন জন সাক্ষী ছিলেন সুব্রত সরকার—(১৪নং সাইপ্রেস রো, কলিকাতা), নলিনী রক্ষিত (৪৮ বি হালদার বাগান লেন, কলিকাতা) এবং অপূর্ব আচার্য (মেডিকেল লজ, ইষ্ট-এণ্ড প্লেস)। তিন জনই লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক এবং জীবিত, প্রয়োজন হলে হুজুর এঁদের সাক্ষী হিসাবে তলব করতে পারেন।

"প্রতিবাদী ডাঃ সুভদ্র রায়ের সঙ্গে আবেদনকারিণীর পরিচয় দুই বছর আগে, করুণাময়ী নার্সিং হোমে। ঐ বছরই মে মাসে আবেদনকারিণী নার্সিং হোমে কাজ নিয়ে আসেন। প্রতিবাদীর সঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেসে তাঁকে কাজ করতে হয়। ডাঃ রায়কে তিনি কয়েকটি জটিল অপারেশন এবং ডেলিভারি কেসেও সহায়তা করেন। এ ক্ষেত্রে বলা সমীচীন, প্রতিবাদী স্ত্রীরোগে অভিজ্ঞ একজন

যশস্বী চিকিৎসক, এই তরুণ বয়সেই বার দুই বিদেশ ঘুরে এসেছেন। প্রথমবার বৃত্তি নিয়ে, দ্বিতীয়বার আপন খরচে—ব্যাপকতর অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানার্জনের বাসনায়।

"ঘনিষ্ঠভাবে এক সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ, কাজের প্রয়োজনে দৈনন্দিন সাহচর্য উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার সৃষ্টি করে। একই রোগী বা রোগিণীর শিয়রে জাগরণে দু জনের রাত্রি কেটেছে। উৎকণ্ঠা, সংশয় উভয়েই বহন করেছেন সমানভাবে, সাফল্যের কৃতিত্ব ভাগ করে নিয়েছেন, অসফল হলে একে অপরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। করবী সুভদ্রর বিচক্ষণতা, বিশ্লেষণী ধী এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায় বিস্মিত হয়েছেন। সুভদ্র করবীর উপস্থিতবুদ্ধি, কর্মনৈপুণ্য এবং নিষ্ঠার তারিফ করেছেন মনে মনে।

"একে অপরকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছেন, সেই শ্রদ্ধা, ধর্মাবতার, পরে অনিবার্য এবং অবশ্যম্ভাবী প্রীতির রূপ নিয়েছে। প্রতিবাদী ডাক্তার প্রথম তেসরা আগস্টে লিখিত এক পত্রে আবেদনকারিণীর কাছে এই প্রীতির কথা ব্যক্ত করেন। (একজিবিট নং দুই)।

"হুজুর পড়লে বুঝবেন, এই চিঠির সবটাই মামুলী প্রেমনিবেদন নয়। আদর্শের কথা আছে, যৌথভাবে সমাজকল্যাণ-ব্রত গ্রহণের সংকল্প আছে। অবশ্য ব্যক্তিগত কথাও কিছুকিছু আছে। প্রতিবাদী শৈশব থেকেই মাতৃহারা, অনাথাশ্রমে মানুষ, পরে মিশনারী স্কুলে লেখা-পড়া শেখেন। জীবনে গুরু বা লঘু বেশী নারীর সংস্পর্শে আসেন নি। রোগিণী ছাড়া ঘনিষ্ঠভাবে কোন মহিলাকে দেখেন নি। আবেদনকারিণীই প্রথম নারী, যিনি তাঁর জীবনে আবেগের আলোড়ন তুলেছেন। তাঁর পায়ের কাছে সুভদ্র আপনার অন্তর উজাড় করে যে ডালি সাজিয়ে রাখলেন, দেবী তা তুলে নেবেন এমন দুরাশা তিনি করেন না, অর্ঘের দিকে দেবী স্মিতকৃতার্থ দৃষ্টিপাত করলেই ভক্ত কৃতার্থ হবেন।

"অবশিষ্ট অংশে, হুজুর, আবেদনকারিণীর রূপের বর্ণনা এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে, বাহুল্যবোধে সেটুকু পড়লাম না।

"এই চিঠিটি প্রতিবাদী আবেদনকারিণীর হাতে তুলে দেন। পরদিন আবেদনকারিণী এর জবাবও দিয়েছিলেন ডাকযোগে। সে চিঠির নকল তাঁর কাছে নেই, অপর পক্ষ ইচ্ছা হলে দাখিল করতে পারেন।

"উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ তো হতই, এবার পত্র বিনিময় শুরু হল। যা মুখে বলতে বাধত, এঁরা তা লিখে জানাতেন। এই রকম এক ডজন চিঠি আবেদনকারিণীর কাছে আসে (একজিবিট নং তিন—চৌদ্দ)।

"প্রতিবাদীর কাছ থেকে পাকাপাকিভাবে বিবাহের প্রস্তাব আসে আরেকটি পত্রে, যেটি পনের নম্বর একজিবিট। ডাঃ সুভদ্র রায় তখন দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন। আবেদনকারিণী তখন ওয়ালটেয়ারে। ডাঃ সুভদ্র রায় এই চিঠিতে মুখবন্ধ হিসাবে হিমালয়ের কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। চিঠিতে আছে: 'তুমি (অর্থাৎ আবেদনকারিণী) ওখানকার সমুদ্রের কথা লিখেছ। আমিও এখানে সমুদ্র দেখছি। না, কথাটাকে নিছক কল্পনা মনে কর না। একটু কবিত্বের ছিটে হয়ত আছে। জান, পাহাড়ও আসলে সমুদ্র। হয়ত খুব প্রাচীন সমুদ্র। তারও তরঙ্গমালা আছে, যত দূরে চাও দেখবে চূড়া আর চূড়া, ঢেউয়ের পর ঢেউ। তবে সমুদ্রের ঢেউ উচ্ছল, সতত চঞ্চল; পাহাড়ের স্থির, কঠিন প্রৌঢ় ঢেউ। যেন অনেক যুগের আগের একটিমাত্র কম্পন, একটি শিহরণকে ধরে রেখেছে। যদি পাহাড়ের সঙ্গে কোথাও দেখা হয় সাগরের, সাগরকে সে বলে, আমিও একদিন তোমার মতই ছিলুম, এখন জুড়িয়ে গিয়ে স্তব্ধ আর শক্ত হয়েছি। তুমিও একদিন আমার মতই হবে। সমুদ্রই কি মৃত্যুর পর পর্বত হয়, শীতল, গম্ভীর, স্থির? অচল কি অতলেরই রূপান্তর? কে জানে!

'যাক, ডাক্তারের এত কবিত্ব সাজে না। এ সব ভয়ে ভয়ে যা বলব করবী, তাও কি সাজবে? কী জানি! কিন্তু বলতেই কি হবে? তুমি কি বোঝনি!'

"এর জবাবে আবেদনকারিণী শুধু একটি কথা লিখেছিল, 'বুঝেছি'।

"পাহাড় থেকে নেমে এল সুভদ্র, সমুদ্রতীর থেকে ফিরল করবী। ধর্মাবতার, তার দেড় মাসের মধ্যেই দস্তুরমত নোটিশ দিয়ে, নাম সই করে ওদের বিয়ে হয়ে গেল।

"বিয়ের সাক্ষী ছিল তিন জন। প্রীতি-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল আরও কয়েকজন অন্তরঙ্গ সখী আর বন্ধু। ডাঃ সুভদ্র রায় নতুন ফ্ল্যাট নিয়েছিলেন লেক-অঞ্চলে। ফ্ল্যাটটি আপন রুচিমত সাজিয়েছিল করবী। দুজনেই বয়সে তরুণ, দুজনেই সঙ্গী থেকে শুরু করে সবই পছন্দমত বেছে নিয়েছে। সুতরাং ওদের সুখী হতে বাধা ছিল না।

"তবু, ধর্মাবতার, এই বিয়ে সুখের হয়নি। হলে আজকের এই আবেদনের প্রয়োজন হত না। আবেদনকারিণী কেন বিচ্ছেদের এই মামলা এনেছে, সহজে তা বোঝানো যাবে না।

"বিবাহ-বিচ্ছেদের মামুলী যে কারণগুলো থাকে, তার কোনটিই এ ক্ষেত্রে খাটে না। প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, প্রতিবাদী সুভদ্র রায় অন্য স্ত্রীলোকে আসক্ত নন, মাত্রাতিরিক্ত পানাসক্তি তাঁর নেই। আবেদনকারিণীকে তিনি কোন রকম শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করা দূরে থাক্, কখনও একটি কটু কথাও বলেননি।

"তবু আবেদনকারিণী এই বিবাহের বিচ্ছেদ চায়। একটিমাত্র কথায় তার কারণটি বলা যেতে পারেঃ যে সম্পর্ক স্থাপিত হলে একটি বিবাহ সম্পূর্ণ হয়, এক্ষেত্রে, এই দম্পতির মধ্যে আজও তা ঘটেনি। ওদের মিলনের প্রমাণ শুধু একটি চুক্তিপত্রের দুটি স্বাক্ষর এবং কিছুকাল একত্র বসবাস।

"ত্রুটি কার বলা কঠিন। আবেদনকারিণীর ডায়েরিতে (একজিবিট নং ষোল) ওদের প্রথম একত্র রাত্রি যাপনের কথা লেখা আছে। তার থেকে খানিকটা যদি পড়ে শোনাই, হুজুর হয়ত ব্যাপারটা কিছু বুঝবেন।

"আবেদনকারিণী লিখছেন : 'আয়োজনে কোন ফাঁকি ছিল না। দক্ষিণখোলা ঘর, কোণে-কোণে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, কিছু বিছানাতেও ছড়ানো। মৃদু-সুরভিত বাসরে একটি স্নিগ্ধ-নীল আলো। বন্ধুদের বিদায় দিয়ে আমরা সেই ঘরে এলাম। আমাদের চার চোখ এক হল।

'কিন্তু যা স্বাভাবিক, তা ঘটল না। আমি এক পা দু'পা করে পিছিয়ে গেলুম। যেন হঠাৎ বিশ্রী গরম পড়েছে, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

'সাজপোশাকে বিলাসের যেটুকু বাড়াবাড়ি ছিল, আড়ালে গিয়ে সে সব খুলে সহজ হয়ে এলাম। ঢিলে জামা-কাপড় পরে খানিকটা স্বস্তি যেন ফিরে পেলাম। বাঁধা চুলের রাশিও এর পর দিলাম খুলে, চিরুনি হাতে বসলাম আয়নার সামনে।

'আড় চোখে ওকে দেখছিলাম। চেনা সেই মানুষটি সহসা কেমন যেন অচেনা, যেন দূরের হয়ে গিয়েছে। দৃষ্টি অপলক—এই দৃষ্টিকে আমি চিনি না। একবার ভাবলাম, ও এবার আমাকে কাছে ডাকবে, কিংবা নিজেই কাছে আসবে। তাই ত' হয়ে থাকে জানি। কিন্তু সে সব কিছু আমাদের বেলা হল না। ও হেলান-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে নির্বিকার ভাবে সিগারেট টানছিল, টানতেই থাকল।

'সে দিনই মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে যে আমার স্বামী হয়েছে, তার এই আচরণ একটু অদ্ভুত ঠেকল। যে হাসি-খুশি-হৈ-চৈ-করা মানুষটাকে আমি চিনতাম, সে কই! এই কি সেই! কী জানি! আমি ভয় পেলাম। অপরিচিত একটা মানুষের সঙ্গে একলা একটা ঘরে, এই রাত্রে ঢুকে পড়িনি ত! সেই মুহূর্তে যেন একটি হিমপ্রবাহ নেমে এল, গুঁড়ো গুঁড়ো সাদা বরফে সেই ঘর, সেই বাসর ছেয়ে গেল। আমার সব পেশী কঠিন হল।

'চিরুনিটা টেবিলের কাঠে ঠুকে ঠুকে ভুতুড়ে ভয়টাকে দূর করলুম। নিজেকে ধমক দিয়ে বললুম—এ কী ছেলেমানুষি করছ!

তুমি না নার্স! কত পুরুষের শিয়রে বসে কত রাত ত কাটিয়েছ। পরিচর্যা করেছ। এই অর্থহীন সঙ্কোচ ছাড়। ও যদি না আসে, তুমি এগিয়ে যাও।

'শেষ সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে ও হেলান-চেয়ারটায় ফের শুয়ে পড়ল। হাত দিয়ে চোখ ঢাকা, একটু পরে দেখলুম, ওর ঘাড় কাত হয়ে পড়েছে।

'এই নীল-নিষ্প্রভ আলোটাও কি ওর চোখে লাগছে? সুইচে হাত দিয়ে মৃদু আলোটাকে যেন ছারপোকার মত টিপে মারলুম। ঘর একেবারে অন্ধকার হল না, সে দিন যে শুক্লা-পঞ্চমী। অতি অস্পষ্ট আলোয় ওর অস্তিত্বের খানিকটা কায়াই রইল, বাকীটা ছায়া হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল, ও যেন বড় রুগ্ন। কঠিন অসুখে ভুগছে, একটু ছোঁয়া পেলে, যত্ন পেলে, পরিচর্যা পেলে বেঁচে যাবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে সব হৃত সাহস, সব আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। এগিয়ে গেলাম, হাত রাখলাম ওর কপালে। আমার নিজের সত্তা ফিরে পেয়েছি। স্পর্শে মমতা, কণ্ঠে মায়া ভরে দিয়ে বললাম—কী হয়েছে তোমার! কী কষ্ট! আমাকে বল।

'ও যেন চমকে উঠল। হাত সরিয়ে নিল চোখ থেকে। বলল কিছু না। কিছু নয়। তুমি—তুমি শুয়ে পড়।

'আমি শুয়ে পড়লাম। বিছানার একটি ধার ঘেঁষে। ভেবেছিলাম, ও এখুনি আসবে। এল না। তখনও গুমোট ছিল, গরম লাগছিল। জামা-কাপড় আরও ঢিলে করে দিলাম। কাজটা হয়ত নির্লজ্জের মত হল। কিন্তু লজ্জাই বা কী! ঘর ত প্রায় অন্ধকার। একটু দূরে যে বসে আছে, সে দেখছে? দেখুক না, সে ত আমার স্বামী। আমাকে সব ভাবে দেখার অধিকার ত ওর আছেই।

'অপেক্ষা করে রইলাম। ও হয়ত আসবে। যে শয়তানীটা আমার মধ্যে আছে, সে ফাঁদ পেতেছে, ও কাছাকাছি আসুক, চেয়ে দেখুক আমাকে, আমার অকুণ্ঠিত রূপকে; ওর জড়তা ঝরে পড়বেই। ও স্বাভাবিক হবে।

'ভাবতে ভাবতে হয়ত কখন তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ জেগে দেখি, ও সত্যিই এসেছে। বিছানার পাশে টেনে এনেছে চেয়ারটা। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার বুক দুরদুর করছিল। এর পর কী হবে, কী হবে! কিছু হল না, শুকনো যান্ত্রিক গলায় ওকে বলতে শুনলুম দেখি, তোমার হাতটা দেখি।

'ওর স্পর্শে কোন জাদু নেই। গলায় ঈষৎ আদেশের ভঙ্গী বাজল। ডাক্তার যে ভাবে রোগিণীকে আদেশ করে। আমার সমস্ত মন আর দেহ বিস্বাদে ভরে গেল। মনে পড়ল, চিকিৎসক হিসেবে এরও আগে শত শত রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে ও দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দেখেও ওর মনে কোন বিকার হয়নি। প্রত্যেকের দিকেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে ও বলেছে—দেখি হাতটা দেখি। আজও সেই নিপুণ, নিতান্তই প্রফেসনাল সুরের প্রতিধ্বনি শুনলাম। সেই মুহূর্তে তীব্র একটা সন্দেহ আমার মনে বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল, অসংখ্যবার সব রকমে দেখে ছুঁয়ে নারীরূপ সম্পর্কে ওর মনে কোন মোহ নেই। সব মেয়েই ওর কাছে রোগিণী। এই লোকটি কোন দিনই স্বামী হতে পারবে না।'

"ধর্মাবতার, আবেদনকারিণীর প্রথম রাত্রির ডায়েরি এখানেই শেষ। আরও কয়েকদিনের অভিজ্ঞতার কথা এর পরে আছে। আপনাকে সে সব পড়ে শোনাতে চাই না। কেননা, সামান্য খুঁটিনাটির তফাত থাকলেও ঘটনা মোটামুটি এক। প্রায় এক মাস ধরে প্রতি রাত্রে এই প্রহসন চলেছিল।

"আবেদনকারিণী এর পরে বিবাদীর ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে আসে। অসত্য দাম্পত্য জীবনের ওপর ওখানেই যবনিকা পড়ে।

"এখানে প্রতিবাদীর দৈহিক পটুতা সম্পর্কে স্বতই সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু আবেদনকারিণী সেই অভিযোগ আনতে চায় না। কেননা প্রতিবাদী নিজেই একজন ডাক্তার। দুরারোগ্য কোন দৈহিক অক্ষমতা থাকলে সে নিজেই জানত এবং নিশ্চয়ই বিয়ে করত না। এ বিয়ের ব্যর্থতার অতএব গূঢ়তর কারণ আছে; হয়ত আবেদনকারিণী

তার প্রথম রাত্রির ডায়েরির শেষাংশে যা অনুমান করেছে, তাই। যাই হোক, সে কোন অভিযোগ আনতে চায় না। শুধু একটা মিথ্যা বন্ধন থেকে মুক্তি চায়।

"হুজুর তার বিনীত আর্জি মঞ্জুর করুন।"

[অপর পক্ষ]

"হুজুর, ধর্মাবতার, আমার মক্কেল ডাঃ সুভদ্র রায় (বয়স তেত্রিশ বছর তিন মাস ছয় দিন) অপর পক্ষের আবেদনের মর্ম অবগত আছেন। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বা কোন বাধা উপস্থাপিত করতে চান না। আবেদন মঞ্জুর হোক, বা হুজুর তাঁর ন্যায়নীতি বিবেচনা প্রয়োগ করে যে কোন রায় দিন, আমার মক্কেল মাথা পেতে নেবে।

"আমার মক্কেল স্বীকার করেন, অপর পক্ষের দরখাস্তে বর্ণিত বিষয় সমুহ বহুলাংশে সত্য। নার্স করবী রায়ের সঙ্গে তাঁর সত্যিই প্রথমে সম্প্রীতি এবং পরে বিবাহ হয়েছিল। দরখাস্তে প্রদত্ত বিবাহের তারিখ, সাক্ষীদের নাম-ধাম ইত্যাদি ঠিক। এই বিবাহ আইনত সিদ্ধ হলেও সম্পূর্ণ বা সার্থক হয়নি, বাদিনীর এই বিবৃতিও ঠিক।

"আমার মক্কেল লক্ষ্য করেছেন, অপর পক্ষের আবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাভিচার, পানাসক্তি বা কোন প্রকার নৃশংসতার অভিযোগ আনা হয়নি। এজন্য তিনি বাদিনীর প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁর দেহগত পটুত্বার বিষয়েও অপর পক্ষের আবেদনে সন্দেহ প্রকাশ বা কটাক্ষ করা হয়নি দেখে তিনি স্বস্তিবোধ করছেন। সত্যিই তাঁর কোন অক্ষমতা নেই। তবু এই বিবাহ সফল হয়নি। কেন হয়নি সে-সম্পর্কে তাঁরও কিছু বক্তব্য আছে। সেটা আমার মক্কেলের নিজের জবানীতেই দাখিল করছি। এটিও এই মামলা সংক্রান্ত নথিপত্রের অন্তর্ভুক্ত হোক, আমাদের পক্ষের এইমাত্র প্রার্থনা।

"আমার মক্কেলের জবানবন্দী এই : 'বিয়ের পরে প্রীতিভোজে অল্প কয়েক জনকেই বলেছিলাম। ছোট ফ্ল্যাট, আমাদের পছন্দ দিয়ে সাজানো।

বন্ধুরা আমাদের রুচির প্রশংসা করল। আমাদের দু'জনকে নিয়ে হালকা ঠাট্টাও করেছিল। হেসেছিলাম আমরাও। তখনও জানতাম না, সমস্ত ব্যাপারটাই প্রচণ্ড রকমের একটা ঠাট্টায় দাঁড়াবে। ওরা চলে যাবার পরেই নিষ্ঠুর একটি নাটকের অভিনয় শুরু হবে।

'কেন? পরে আমি অনেকবার ভেবেছি, এক-একটি যন্ত্রণা-কণ্টকিত বিনিদ্র রাত কেটেছে আর ভেবেছি, কেন সমস্ত জিনিসটাই এমন ব্যর্থ হল! বাধাটা আসলে কোথায়! ঠিক ঠাহর করতে পারিনি। সেই রাত্রিটার অনুভূতি স্মৃতি সব মিলে মিশে মনে একাকার হয়ে আছে।

'ও যখন পাশের ঘর থেকে পোশাকী পরিচ্ছদ বদলে ফিরে এল, আয়নার সম্মুখে বসল চিরুনি নিয়ে তখনও ওকে আমি কামনা করেছি। একবার ভেবেছি কাছে ডাকি। কিন্তু ডাকিনি। কী খেয়াল মাথায় চাপল, ভাবলুম, আমি যাব কেন, ওই আসুক না। একটু নতুনত্ব করা যাক। আমি এখানে এই দূরের হেলান-চেয়ারটাতে শুয়ে থাকি, দেখি ও আসে কি না! যেই আসবে, যেই আমাকে স্পর্শ করবে, আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে টেনে নেব। চোখ বুজে এই সব ভাবছিলুম, আসন্ন অসহ সুখানুভবের কল্পনায় আমার রোমাঞ্চ হয়েছিল।

'হয়ত এই বিচিত্র খেলার খেয়ালেই সব এলোমেলো হয়ে গেল। অস্বাভাবিক কিছু করতে গিয়েই বিপত্তি ঘটল। জানতুম মেয়েদের সহজাত সঙ্কোচ বেশী; অগ্রসর হতে হয় পুরুষকেই। নিয়মের ব্যতিক্রমে পরীক্ষাটা সফল হয় কি না চোখ বুজে তারই প্রতীক্ষা করে রইলুম।

'ও আসে না। ঘড়ির টকটক শুনছি, ঝিরঝিরে হাওয়ায় জানালার বাইরের শিরীষ গাছটা থেকে অনেক শুকনো পাতা ঝরে পড়ল, করবী এল তারও অনেক পরে। কানের কাছে শাড়ির খসখস শুনলুম। ও এসেছে। তখনও চোখ খুললুম না। দেখি না কী হয়, ও কী করে।

'শুনতে পেলাম, ও বলছে—কী হয়েছে তোমার! কী কষ্ট, আমাকে বল।

'এ কী গলা! ম্রিয়মাণ, যান্ত্রিক। আমি কি এরই প্রতীক্ষা করে ছিলুম!

'ও আমার কপালে হাত রাখল। নিরুত্তাপ হাত, হিমশীতল। এ ত আমি চাইনি। ঠিক কিসে আমার আশা ভঙ্গ হল বোঝাতে পারব না। আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারিনি। সে কি ওর কণ্ঠস্বরে নিপুণা একটি নার্সকেই শুনতে পেলুম বলে! ও প্রথমেই কষ্টের কথা তুলল কেন! ও ত নার্সদের বাঁধা আর অভ্যস্ত বুলি। আজকের রাত্রির গোড়ার কথা কি এই হওয়া উচিত?

'মিটমিট করে চাইলাম। হয়ত ভুল বুঝেছি, কিন্তু যে ভাবে ও চেয়েছিল তাতে সেদিন পাতালের এক ঝলক জলের মত একটা কথা মনের ওপরের স্তরে উঠে এসেছিল : আমি একজন পাসকরা পেশাদার ধাত্রী বা সেবিকাকেই বিয়ে করে এনেছি, ও কোনদিন রক্তমাংসের স্ত্রী হতে পারবে না।

'তাই নিরাবেগ গলায় ওকে বলেছি—কিছু হয়নি। শুয়ে পড়।

'করবী দরখাস্তে বলেছে—পরে আমার মধ্যেও, আমার আচরণেও ও নারীদেহ বিষয়ে মোহ-বিকারহীন একজন চিকিৎসককেই দেখতে পেয়েছে।

'হয়ত ওর কথাও ঠিক। হয়ত ও যা বলেছে আমি তাই। আবার আমি যা ভেবেছি, ও নিজেও তাই হতে পারে। এটাই খুব সম্ভব সত্য যে আমরা দুজনেই ঠিক ভেবেছি ও বলছি। নিপুণা নার্স আর অভিজ্ঞ ডাক্তার মিলবে না কেন, মিলবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তারা ভাল জুটি। কিন্তু পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়। নিভৃত একান্ত জীবনে দুজনেই অন্য রকম সঙ্গী চায়। অন্যের কথা বলতে পারিনা, অন্তত আমরা তাই চেয়েছি। এই বিবাহটা একেবারে মিথ্যে হয়ে গিয়েছে সেই কারণে। এর চেয়ে বিচ্ছেদ শ্রেয়।'

"ধর্মাবতার, আমার মক্কেলও তার জবানবন্দীর শেষে বলেছে, 'বিচ্ছেদই শ্রেয়।' অতএব অপর পক্ষের অর্থাৎ করবী রায়ের দরখাস্ত মঞ্জুর হোক, এ পক্ষের আপত্তি নেই।"

এই লেখাটা তোমার চোখে পড়বে কিনা জানি না সুচিরা, না পড়লে কিন্তু নিশ্চিন্ত হই। অসঙ্কোচে আমার সেই লজ্জার কথাটা বলতে পারি।

এসব কথা অবশ্য লোকে ঘটা করে বলে না। আমরা অনেকেই কিল খেয়ে কিল চুরি করে থাকি কিনা। তবে ঘটনাটা খুব ছোট আর তুচ্ছ আর পুরনো ত, এখন বলতে তাই বাধা নেই। তখনকার আমি আর এখনকার আমি অনেকটাই আলাদা হয়ে গিয়েছি, কাজেই সেই-আমির একটা বোকামি নিয়ে ঠাট্টা করতেও আমার আপত্তি নেই। মনে হবে যেন অন্য কারুর কথা বলছি।

জানতে সাধ হয় সুচিরা, তুমি এখন দেখতে কেমন হয়েছ। তখন ত তুমি—সংস্কৃত করে বলব ?—প্রভা-তরল দ্যুতির মত ছিলে। ছিলে যে, তা তুমিও জানতে। সাজতে ভালবাসতে। আর আয়নার সামনে বসে নিজেকেই বিভোর হয়ে দেখতে। আর শাড়ির সঙ্গে জামার রঙ ম্যাচ করানোর উপায় জানতে। ধর, সবুজ ব্লাউজ যদি পরেছ তবে তার বর্ডার হত সোনালী, শাড়ি নীল। পীতে-হরিতে-নীলে মিলে মিশে প্রায় ইন্দ্রধনুর শোভা হত।

জানি না শরীরটাকে এখনও ছিপছিপে রাখতে পেরেছ কি না, জীবনে যে স্বাচ্ছন্দ্য চেয়েছিলে, তার কতটা পেয়েছ। আচ্ছা বল ত, তোমার কি পোষা দুটি কুকুর আছে ? তারা বুঝি অসম্ভ্রান্ত কেউ বাড়ির হাতায় ঢুকলে তেড়ে আসে আর মানী লোক দেখলে শুধু জুতো শুঁকে চলে যায় ? তোমাদের বাগানের কোণে কোণে কি রৌদ্রের দর্পহারী রঙিন ছাতা আছে ? একটু বাড় দেখলেই ঘাসগুলোর মাথা মুড়িয়ে জল ঢেলে দাও ? আর তোমার সব চেয়ে বড় শো-পিস,—তোমার ইঞ্জিনিয়ার স্বামী ? তিনি কি এখনও তেমনই তুখোড়

সাহেব? যিনি হাসেন, হাসি পেয়েছে বলে নয়—ঝকঝকে দাঁতের সারি দেখাতে। তাঁর বিলাতী ধরনের হাসি কতবার দেখেছি। তাঁর কাশিটা শুনিনি, যদিও ঘন ঘন সিগারেট খেতে দেখেছি। সেই দামী সিগারেটে আমার লোভ ছিল। বিচক্ষণ লোক ত, আমার দুর্বলতাটুকু অনুমান করেছিলেন। প্রথম আলাপেই একটা সিগারেট অফার করেছিলেন। তোমার মনে আছে? সেখানে ত তুমিও ছিলে। উলের বলটাকে মাটিতে ফেলছিলে আর তুলছিলে।

স্বচ্ছন্দের কথাটা না হয় ধরেই নিলুম, এবার খুব আস্তে তোমাকে সুখের কথা জিজ্ঞাসা করি। তুড়ি দিয়ে যে ভাবে আয়া-আরদালীকে তলব কর, সুখকেও কি সেইভাবে খুব সহজে মনের মধ্যে ডেকে আনতে পার? অনেক সাধই তোমার পূর্ণ হয়েছে জানি, কিন্তু যা-কিছু চেয়েছিলে, সব কি পেয়েছ?

তোমার অন্তত একটি অপূর্ণ সাধের কথা জানি। সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে নাম করতে চেয়েছিলে। পারনি। তোমার নাম ত কোথাও শুনিনে। বড় জোর আজও পাড়ার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ছোটখাটো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছ।

আমাদের সেই মফস্বল শহরে কিন্তু, সুচিরা, তোমার পাশাপাশি দাঁড়াবার মতনও কেউ ছিল না। এসেই চমক লাগিয়ে দিয়েছিলে। আমরা কূপের সব কটি মণ্ডুক প্রথমে সন্ত্রস্ত হলেও পরে মহানন্দে ডাকতে শুরু করেছিলুম।

ডাকব নাই বা কেন! মেয়ে ত ঘরে ঘরেই আছে, তাদের বেশির ভাগই ভীত, আড়ষ্ট, বয়সের ভারে বিব্রত; যেন বয়সটা বেড়ে গেছে। এটা তাদেরই দোষ। মনে রেখো সেই আমলের কথা বলছি, যখন আমাদের সেই মফস্বল শহরে মেয়েরা বাইরে বেশি বেরতে পেত না। তাদের দেখা যেত বাড়ির জানলায়, গরাদে মুখ রেখে করুণ চোখ দিয়ে তালগাছের মাথায় শকুনের বাসা দেখছে। কাঁঠালপাতায় তেল মাখিয়ে কাজল পরত; বিনুনি ঝুলিয়ে প্রাইমারি স্কুলে পড়ার পাঠ চুকলে পাতা কেটে চুল বাঁধত। বিধিদত্ত যেটুকু রূপ, তাকে ফুঁ দিয়ে বাড়িয়ে

তোলার কৌশল প্রায় জানতই না। লুকিয়ে পড়ত নবেল; অনেকে তাও পড়ত না; কেননা বার কয়েক সেজেগুজে পাত্রপক্ষের সামনে পরীক্ষা দিয়ে উতরে গেলেই স্বামীর ঘর করতে চলে যেত। ফিরে আসত যখন, তখন কোলে-কাঁখে ছেলে।

তুমি ত একেবারে আলাদা জগৎ থেকে এসেছিলে। সাত দিনেই সাড়া পড়ে গেল। কানাঘুষায় শুনলুম, নতুন সব-জজের মেয়েটি একেবারে মেমসাহেব।

মেমসাহেব! যে মেয়ে ঘুরিয়ে জংলা ছাপের সিল্কের শাড়ি পরে, চুল ফাঁপায় আর উঁচু গোড়ালির জুতো পরে মাটির ইঞ্চিখানেক ওপর দিয়ে চলে, তাকে বর্ণনা করার জন্যে আমরা ওই একটি কথা সেদিন খুঁজে পেয়েছিলুম: মেমসাহেব।

দুবার বি. এ-ফেল করে বাড়িতে বসে আছি, দুপুরে তাস খেলি, বিকেলে সাইকেলে চড়ে চক্কর দিয়ে ফিরি, সন্ধ্যাবেলা পাবলিক লাইব্রেরিতে আড্ডা দিই, কিংবা পুজোয় কোন্ ঐতিহাসিক প্লে-টা জমবে সেই পবামর্শ করি।

আমাদের আলোচনার আরও একটা বিষয় বাড়ল, তুমি। আমরা বলাবলি করতুম, 'মেমসাহেব!' মেমসাহেব। তার মানে রঙ কটা? কটা বলতে কটা! সার্কেল-অফিসারের ছেলে নাজির বলত, একেবারে মুর্গীর ডিমের মত কটা, লালচে আভাও আছে। আমরা তখন ফরসা রঙকে কটা বলতাম। ঠোঁট কেমন? মোরগের ঝুঁটির মত টুকটুকে। আর চোখ? বলতে পারব না। আমাদের দিকে তাকায় না ত।

নাম? তাও এ দিন জানা গেল। পোস্ট-অফিস থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে একদিন ফিরে এল নীরদ, বলল, জেনে এসেছি।

কী? না, নাম। কী নাম? সুচিরা। একটা পার্শেল এসেছে তোমার নামে, তার ওপরে বড় বড় করে ওই নামটাই লেখা আছে।

সুচিরা। সেই কমলা-বিভা-শান্তিদের যুগে তোমার নামটাও চেহারার মতই চমক-লাগানো।

আলাপ করা যায় না ? আমরা বলে উঠলুম, নিশ্চয়ই যায়। কেন যাবে না! আমরাই আবার একটু পরে বললুম, খুব সহজও না। আলাপ হয়ত করবেই না। কলকাতার ফিরিঙ্গী স্কুল থেকে পাস-করা মেয়ে, মফস্বলের কয়েকটি নিষ্কর্মা ছেলেকে আমল দেবে না, এটুকু বোঝবার বুদ্ধি আমাদের ছিল।

তা ছাড়া গিয়ে দাঁড়ানোর ছুতোও ত চাই। কী বলব ? একজন বললে, 'ধর, যদি বলি আমাদের ক্লাবের সরস্বতী-পুজোর ফাংশনে আপনাকে গাইতে হবে ?'

গাইবে কেন ? আমাদের অনুষ্ঠান মানে ত শখের থিয়েটার! অর্থাৎ যাত্রা। বেশির ভাগই পৌরাণিক নাটক। সে সবে কি ওরা আসে ?

তুমি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ। ভাবছ, আমাদের রুচি নামে জিনিসটাই ছিল না। অচেনা একটি মেয়েকে নিয়ে কি এত আলোচনা করাটা সুরুচি ?

তোমার কাছে স্বীকার করি, আমাদের মধ্যে এইসব আলোচনাই চলত। বেকার ছেলেদের নিরাশ জীবনে ও ছাড়া আর কী-ই বা বৈচিত্র্য ছিল!

বড়াই করে তোমাদের বাসায় গেলুম বটে, কিন্তু গেটের বাইরে সাইকেলটা কাত করে রেখে তোমাদের বারান্দায় যখন গিয়ে দাঁড়ালুম তখন আমার বুক দুরদুর করছিল।

খবর পাঠাতে হবে, কাকে ধরি, কাকে বলি। এ সব অভ্যাস ত আবার আমাদের নেই। আমরা যখন-তখন যার-তার বাসায় যাই, সাইকেলের দুপাশ দিয়ে পা নামিয়ে দিয়ে মাটি ছুঁই, ক্রিং ক্রিং করে হুট করে চলে যাই একেবারে ভিতরে, 'মাসিমা' বলে একবার হাঁক দিয়ে রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসে পড়ি।

সাত-পাঁচ ভেবে হয়ত ফিরেই আসতুম, কিন্তু ভাগ্য ভাল, আপনা থেকেই দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এলে তুমি। একেবারে মুখোমুখি সেই প্রথম দেখলাম। মাথায় চিরুনিটা গোঁজা, খুব হালকা নীল রঙের একটা শাড়ি পরে আছ, পায়ে স্যাণ্ডাল। সহজ পোশাকেও তুমি

কত সুন্দর, দেখলুম। টুপি টাঙানোর র‍্যাকটায় ঝুলছিল আয়না, সেটায় আমাকেও দেখতে পেলুম। শাদা টুইলের শার্ট, কলার ফাটা, ইস্ত্রিটাও ভাল করে করা নেই। নিজের চেহারা এবং পোশাকের দীনতার জন্যে সেই প্রথম কুণ্ঠাবোধ করলুম।

জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে বললে, আপনি? ভেবেছিলাম বসতে বলবে। একবারও বলনি। টানা-পাখা চলছিল, কিন্তু টানা-পাখায় গরম যায় নাকি! রুমাল নেই, ধুতিটাকে পরে আছি মালকোঁচা দিয়ে মুখটা মুছে একটু সাহস ফিরিয়ে আনব সে উপায় কই!

বললাম, একেবারে নির্বোধের মত বললাম—আমাদের একটা ক্লাব আছে।

ও বুঝেছি। বাবার কাছে চাঁদা চাইতে এসেছেন?

ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, না, আপনার কাছে।

বলার ভঙ্গিতে নিশ্চয় হাস্যকর কিছু ছিল, তুমি একটুখানি হাসতে গিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছ। মনে হল যেন ভ্রূকুটি করলে। তখনও জানি না যে তোমার ভ্রূকুটি মানে বিরক্তি নয়। ভুরু দুটি কাছাকাছি হলে তোমাকে আরও ভাল দেখায়। তুমি ত সেটা জান।

আমি কিন্তু ভয় পেয়েছিলুম। কোথায় গেল সাহস, মনের ভিতরে চেয়ে তাকে কোথাও খুঁজে পাইনে। ব্যূহে ঢুকে পড়েছি, এখন সশরীরে বেরুতে পারলে বাঁচি। গড়গড় করে বলেছিলুম, আমরা একটা ফাংসন অর্গানাইজ করছি, যদি আপনি পার্টিসিপেট করেন—

তোমাকে মুগ্ধ করতে অনেকগুলোই ইংরেজী শব্দ পর পর বলে ফেলেছিলুম, মনে আছে। তুমি হাসি লুকোতে সেদিন মুখ ফিরিয়ে ছিলে কেন! আচ্ছা, আমার উচ্চারণে কি ভুল ছিল?

বললে, আপনাদের ক্লাবে কী কী হয়?

উত্তর দিয়েছি, মাঝে মাঝে থিয়েটার করি।

—তার মানে পুরুষেরাই ফিমেল পার্ট করে ত? মাপ করবেন, ও সবের মধ্যে আমি যেতে পারব না। আচ্ছা, নমস্কার। বলেই

ভিতরে চলে গিয়েছিলে, আমাকে প্রতিনমস্কার করবার সুযোগও দাও নি।

না, সেদিন ঠিক অপমান করেছিলে বলতে পারব না, তবে যে তাচ্ছিল্য তোমার মুখে ফুটে উঠেছিল, সেটা আমি অনেক দিন ভুলতে পারিনি। ভাগ্যিস আমার জামার পিছন দিকটা তোমার চোখে পড়েনি—ওটা ঘামে ভিজে পিঠের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিল।

বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার লোভ তখনকার মত ওখানেই ইতি পড়েছিল। এমন কি, তোমাকে ঘিরে প্রাথমিক চাঞ্চল্যটাও যেন একটু থিতিয়ে আসছিল। বড়লোকের মেয়ে তাতে আবার কলকাতায় লেখাপড়া শিখছ, তোমার চাল-চলন একটু আলাদা রকমের হবে বই কি। তুমি ত খুটখুট করে জানান দিয়ে রাস্তা চলবেই, রঙিন বেঁটে ছাতাটার আড়ালে রোদে-তাতা মুখখানার আভাস মাত্র দেখা যাবে; মাঝে মাঝে মুখশ্রী মেরামত করতে মাঝপথে দাঁড়িয়েই ছোট আয়নাটা সামনে ধরে পাউডার বোলাবে। আমরা বলাবলি করতাম, 'আমরা পাঁচজন দেখছি, ওর লজ্জা করে না?'

আমাদেরই কেউ আবার বলত, 'লজ্জা আবার কী! এখানকার কাউকে ও আবার মানুষ বলে মনে করে নাকি!'

করে না, সে ত জানি। তবু মনের কাঙালপনা কোথায় যাবে। বিকেলে বন্ধুর মনিহারী দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছি, কাজ-টাজ নেই ত, কোন্ চুলোয় বা যাব, তোমাকে সেখানে দেখে আমরা সকলে শশব্যস্ত হয়ে উঠলুম। একেবারে নিঃসঙ্কোচে ভিতরে ঢুকে কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালে।—ডি. এম. সি. সুতো আছে আপনাদের?

—আছে।

কিন্তু যে রঙের নমুনা দেখালে, অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেও তা পাওয়া গেল না। একটু হতাশ, একটু বা বিরক্ত হয়েও বললে, 'কী জায়গা এটা! এই সামান্য জিনিসটাও কলকাতা থেকে আনিয়ে নিতে হবে?'

জায়গার সম্মান রাখতে না আলাপটা ঝালিয়ে নিতে আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলুম, আমি নিজেও জানি না। বললুম,

'জেলা-সদরে বোধ হয় পাওয়া যেতে পারে। নমুনাটা আমাকে দেবেন ? একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

পরদিনই জিনিসটা পৌঁছেও দিয়ে এসেছিলাম। সেদিন কিন্তু বিশেষ ভয় করেনি। জিনিসটি পেয়ে তুমি খুশী হয়েছিলে কিনা, মিষ্টি করে হেসেছিলে। দামের সঙ্গে আমার গাড়ি ভাড়াও যখন দিতে চাইলে, নিইনি। বলেছি, সামান্য কাজের জন্যে আবার—

নতুন একটা কাজের ফরমাস নিয়ে সেদিন চলে এসেছি। একটু খারাপ লাগত আমার, যখনই যেতুম, হেসেই কথা বলতে, কিন্তু কোনদিন বসতে বলনি। কাজটুকু শেষ হতেই বলেছ, 'আচ্ছা নমস্কার।' একটু বসে গল্প করতে দিলে কী ক্ষতি হত, না কি ভাবতে আমাদের ক্লাসের ছেলের সঙ্গে বসে কথা বলায় তোমাদের মানহানি ?

তবু আমাদের শীতকালের থিয়েটারটা দেখতে এসেছিলে বলে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমিই গিয়ে কার্ডটা গছিয়ে এসেছিলুম ; দেখতে সত্যিই আসবে এতটা আশা করিনি। এলে কিন্তু, হয়ত আমার খাতিরেই এলে। দুটো অঙ্কের মাঝখানে বিরতির সময় গ্রীনরুমেও এসেছিলে। বলেছ, 'চমৎকার হচ্ছে কিন্তু আপনার অভিনয়। মেয়েদের এত নিখুঁতভাবে নকল করতে পারেন আপনি ?'

আমি ফিমেল পার্টে নেমেছিলুম। তোমার প্রশংসা পেয়ে সেদিন প্রাণ ঢেলে দিয়ে অভিনয় করেছি।

কিন্তু তখনও বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার অলক মজুমদারকে দেখিনি। যে দিন তার মোটর সাইকেলের সাইড-কারে বসে শহর ঘুরে বেড়ালে সেদিন শহরে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কে, কে এই লোকটি, যার ট্রাউজারের ভাঁজে কোন খুঁত নেই, কড়কড়ে কলারের নীচে নিত্য-নতুন টাই, জুতোয় একবিন্দু ধুলো নেই, মুখে সিগারেটের নেই কামাই ? জানতেও দেরি হল না। নাম পরিচয় সব জেনে ফেললুম। দূর-সম্পর্কের যে ছুতো ধরে তোমাদের বাসায় এসে উঠেছেন, সেটা বেশী দিন দূরে থাকবে না, শীগগিরই কাছে হবে, তার আভাসও পেলুম। এমন কি একদিন আলাপও হল। তুমিই করিয়ে দিলে।

লনে দুজনে বসে ছিলে চেয়ার পেতে। আমাকে সাইকেলে করে যেতে দেখে ডাকলে। বললে, 'অলক, জান ইনি একজন আর্টিষ্ট। বেশ ভাল অ্যাক্টর। মেয়েদের পার্ট এমন চমৎকার করেন কী বলব।'

অলকবাবু বললেন, 'সত্যি? মেয়েদের পার্ট করেন আপনি? I should say that's rather interesting. কী করে করেন বলুন ত? গলাটাকে মিহি করেন কী করে?'

আমি লজ্জিত বিনীত ভঙ্গিতে হাসলুম।

'একটু শোনাবেন? ছোট্ট একটা পিস্?'

আমার বিবেচনা-বোধ একেবারে তিরোহিত হয়নি। বললুম, 'এখানে কী, এখন কী—পরে শোনাব। আমাদের বড়দিনের প্লে-টা আপনি নিশ্চয়ই দেখছেন?'

'বড়দিন?' দাঁতে ঠোঁট চেপে মজুমদার সাহেব একটু ভাবলেন, মুখে ঈষৎ হাসি খেলে গেল। 'বড়দিন? But by Christmas we should be in Bombay! Both of us—না সুচিরা?'

সাহেব চাইলেন তোমার দিকে। তুমি মাথা নিচু করলে। একটু আরক্ত হলে কিনা, বলতে পারব না, কেননা কপোলে কৃত্রিম রক্তিমা তো তোমার বরাবরই থাকে।

সাহেব আমাকে একটা সিগারেট দিলেন। টিনটা ঘুরিয়ে বললেন, 'ফুরিয়ে এসেছে। এখানে কি এই ব্র্যাণ্ড পাব! I wonder—'

তুমি বললে, 'জেলা-সদরে বোধহয় পাওয়া যেতে পারে।' জিজ্ঞাসু চোখে চাইলে আমার দিকে। ইচ্ছা ছিল না, তবু হাত পেতে টাকা নিলুম। সিগারেট পৌঁছেও দিয়ে এসেছিলুম। ভয় ছিল, সাহেব খুচরোটা আমাকে বকশিশ না দিয়ে বসেন!

বন্ধুরা ঠাট্টা করতে শুরু করেছিল।—কী রে, খুব ফাই-ফরমাস খাটছিস? বলত, এরাণ্ড-বয়। কথাটা সম্মানের নয়। আমি মানতাম না, মানতে চাইতাম না। জোরে জোরে মাথা নাড়তাম, আর মনে মনে বলতাম, কক্ষনো না, ওরা হিংসুটে, ওরা ছোট, ওদের মন নিচু। ওরা

আমাকে ছোট করেছে, তোমাকেও। একদিন ওদের প্রমাণ দিয়ে দেব—

এবার সেই প্রমাণ দেবার দিনটি দিয়ে আমার কথা শেষ করি। তোমার মনে আছে, সেই বিকেলটা? মেঘলা দিনটি কি অপরূপ সুন্দর মৃত্যুর মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছিল। আমি নদীর পাড়ে বসে ছিলাম, আর নুয়ে-পড়া বড় বড় ঘাসের শিষ ছিঁড়ে জলে ফেলছিলাম। ফড়িংও গুণছিলাম, একটি দুটি করে ওরা উড়ে উড়ে আসছিল। তবে তাদের ধরতে যাইনি, চেষ্টা করিনি, ওদের ধরা যায় না। একটা দুটো বকও সেই নির্জন নদীর তীরে কাশের ঝোপের এদিকে ওদিকে বসেছিল। আমাকে দেখছিল। ভাবছিল, এ-লোকটা এখানে বসে আছে কেন, সবুজ ঘাসের ডগা ছিঁড়ছেই বা কেন!

কেন, তা কি আমিই জানতাম! আমি ভাবছিলাম। আমি তো নদীর কালো জলে মুখ দেখিনি, যে বিকেলটা আরও সুন্দর হতে হতে একটু পরে মরে যাবে, তাকেও ভাল করে অনুভব করিনি। আমি ছোট কয়েকটি নুড়ির মত দুঃখ মনে নাড়া-চাড়া করছিলাম।

সুচিরা, আমাকে সেখানে দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে। অস্ফুটস্বরে বলেছিলে, 'আপনি!'

অবাক হয়েছিলুম আমিও। ঠিক এখানে, শহর থেকে এত দূরে, যেখানে পৌঁছুতে চোরকাঁটায় কাপড় ছেয়ে যায়, জুতোটাও কখনও কখনও খুলে নিতে হয় হাতে, সেখানে তোমাকে ঠিক আশা করিনি। সেই বিষণ্ণ বিকেল, যে নিজে মরবে সেই সঙ্গে কালো নদীর জলধারাকেও রক্তাক্ত করে তুলছে, সেই বিকেলের, সেই নদীতীরের ছমছমে পরিবেশের তুমি তো কেউ নও।

এখানে তোমাকে মানায়নি।

মানায়নি, তবু আশ্চর্য, দেখ, তোমাকে দেখে আমি সব ভুলে গেলুম। দুঃখ-বোধের নুড়িগুলোকে ফেলে দিলাম জলে, বললুম, 'বসুন।' বলেই কিন্তু শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলুম, তুমি যদি ধৃষ্টতা মনে কর? তুমি আস্তে আস্তে এগিয়ে এলে, একটু পরিষ্কার জায়গা ছিল

আমার পাশেই, আলগোছে পা ফেলে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে। বললাম, 'বসবেন না ?'

তুমি বললে, 'বসি ?' যেন অনুমতি চাইলে।

পা ঝুলিয়ে দিয়েছিলে। নুয়ে-পড়া ঘাসের শিষের ওপর দিয়ে ক্ষীণস্রোত জলে তার ছায়া পড়েছিল। ধবধবে দুটি পায়ের পাতা একটু রক্তাভ, আমি শিউরে উঠেছিলুম। তুমি আলতা পরতে না। তখন মনে হয়েছিল পরলে আরও মানাত।

তুমিও একটি-দুটি ঘাসের শিষ দাঁতে কাটছিলে, ছোট ছোট ঢেলা জলে গড়িয়ে দেখছিলে, কেমন ঢেউ ওঠে। একবার তুমি উঠে দাঁড়ালে, ফের বসলে। একবার মনে হয়েছিল, তুমি যেন উসখুস করছ, যেন কী ফেলে এসেছ। আমি কাঁপছিলাম। তুমি কথা বলছিলে। খুব মৃদুস্বরে, সেই নির্জন পরিবেশ আর ধীরবহ নদীর কল-ধ্বনির সঙ্গে তোমার গলা আশ্চর্যভাবে মিলে গিয়েছিল।

অথচ তুমি এমন কিছু বলছিলে না। এতদিন ধরে আমাকে দেখছ অথচ আমার বিষয়ে কিছুই জান না। এতদিন তো শুধু ফরমাসী কাজ আর দরকারী কথা বলেছ, বিনে কাজের কথা সেই প্রথম বললে। খুব তুচ্ছ কথা—আমার বাসায় কে আছে, কী করি সারাদিন, থিয়েটার-করা ছাড়া আর কী নেশা আমার আছে! আমার কাজ জুটছে না কেন, কোথায় চেষ্টা করেছি, কোথাও করেছি কি না! নিজে থেকেই বললে, তোমার বাবাকে বলে আমার একটা সুবিধা করে দেবে।

তুমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করছিলে, আমি আস্তে আস্তে জবাব দিচ্ছিলুম। কী যে ভাল লাগছিল! জবাব দিচ্ছিলুম আর অবাক হয়ে ভাবছিলুম, এই কথাগুলো জিজ্ঞেস করবে বলে কী তুমি এতদূর এসেছ! তুমি কি জানতে আমি এখানেই থাকব! কী করে পথ চিনে এলে!

যে-আনন্দে আমার মন কানায় কানায় ভরে দিয়ে ছাপিয়ে পড়ছিল, তাকে কৃতজ্ঞতাও বলতে পার। আপসোসও হয়েছিল। এই সময়ে আমার বন্ধুরা এখানে নেই। নেই, ভালই। তবু কাছা-

কাছি থাকলে ভাল হত। তারা নিজেদের ভুলটা টের পেত। আমাকে তুমি শুধু ফাই-ফরমাস খাটানোর প্রয়োজনেই ব্যবহার করনি, মানুষ বলেও স্বীকার করেছ। আমার নিভৃত দুঃখের পাপড়িগুলোকে আঙুল দিয়ে ছুঁয়েছ। যে বিলাসিনী, সেই আবার করুণাময়ী।

তাই বলে ভেব না, সেই মুহূর্তে আমার বিচার-বিবেচনা বিসর্জন দিয়েছিলাম। পাশে এসে সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করেছ বলেই ভাবিনি যে তুমি আমারই হয়ে গেছ। আমি জানতাম তুমি যার, তুমি তারই। তুমি যেখানকার, সেখানেই ফিরে যাবে। মনে মনে নিজেকে বারবার বললুম, 'শুধু এই দিনটি আমার, এই ক্ষণটি আমার; এই বিকেলটুকু আমাকে দেবে বলেই ও এতদূর এসেছে।'

চারধার অন্ধকার হয়ে এসেছিল। সব যেন আরও চুপ। ঝোপের আড়ালে ঝিঁঝিঁ ডাকছিল। শিকারী বকেরা উড়ে গেছে কখন, ফড়িং ক'টাকেও আর দেখা যায় না।

গাঢ় গলায় বলে উঠলুম, 'একটা গান শোনাবেন?'

'গান?' তুমি যেন চমকে উঠলে, বললে, 'গান?' হাতের ছোট্ট ঘড়িটা দেখলে একবার, চারদিকে চাইলে। মাথা নিচু করলে। আমি অপেক্ষা করে রইলুম, কখন সুরের একটি লীলায়িত রেখা এই নৈঃশব্দ্যকে পরম মমতায় পাকে পাকে জড়িয়ে একেবারে নিজের করে নেবে।

ঠিক তখনই পিছনে শুকনো পাতায় খস খস শব্দ হল, তুমি আবার চমকে উঠলে। পিছনে ঝাউগাছটার আড়ালে একটা দীর্ঘ ছায়া দেখা গেল। এক পলকের জন্য হাসি ফুটে উঠল তোমার মুখে। একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে বললে, 'ও এসেছে।' উঠে দাঁড়ালে, পায়ের পাতা আবার জুতোর স্ট্র্যাপে ঢাকা পড়ল, বললে, 'এবার যাই? আর একদিন গান শোনাব।'

ঝাউগাছের আড়ালের সেই ছায়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে। ফিসফিস করে বললে, 'এত দেরি করলে? অন্ধকার হয়ে গেছে, আমার যা ভয় করছিল!'

লক্ষ্মী কহিল, তা আছে, নেই শুধু তোমাদের পাড়াগেঁয়ে মেয়ের সঙ্গে কোঁদল করবার শিক্ষা।

মেজবৌ এই কটূক্তির জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

লক্ষ্মী চলিতে উদ্যত হইয়া বলিল, ওই হারটুকুর দাম যাই হোক, ছেলেটাকে স্নেহবশেই দিয়েছিলাম, তোমার স্বামীর দুঃখ দূর হবে ভেবে দিই নি। মেজবৌ, বড়লোকমাত্রেই গরীবকে শুধু অপমান ক'রে বেড়ায়, এইটুকুই কেবল শিখে রেখেচ, ভালবাসতেও যে পারে, এ তুমি শেখো নি! শেখা দরকার। তখন কিন্তু গিয়ে হাতে পায়ে পোড়ো না।

প্রত্যুত্তরে মেজবৌ শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, না দিদি, সে ভয় তোমাকে করতে হবে না।

স্বদেশবাবু জেনেছেন, মেয়েটির নাম ঝিনুক। অন্তত এই নামে ওকে ওর মা ডাকে, বাবা ডাকে, পিসি ডাকে; ও সাড়া দেয়। স্বদেশবাবু ডাকলেও, যদি তিনি ডাকেন, যদি ডাকতে কোনদিন তার সাহস হয়, হয়ত সাড়া দেবে। স্বদেশবাবু ঠিক জানেন না। কেন না, আজও পরখ করে দেখেননি। তিনি শুধু জেনেছেন। শুধু নামটুকু, মানে ডাক-নামটুকু। তোলা নামও নিশ্চয় একটা আছে, বইয়ের পাতায় বা স্কুল কলেজের খাতায়, সেটা জানবার সুযোগ স্বদেশবাবুর হয়নি। আট ফুট পরিসর গলির এ-পাশে কান খাড়া করে অতটা জানা যায় না। জানতে হলে কথা বলতে হয়, কথা বলতে হলে হাতছানি দিতে হয় বা চোখে চোখে ইসারা করতে হয়। ওসব কাজ যারা মরীয়া, যারা নাম লেখান বদমাস, তারা পারে। অনতিনবীন অধ্যাপকেরা পারেন না, বিশেষতঃ সেই অধ্যাপকেরা, যাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা আছে, সুনাম আছে। যাঁরা পথে বেরুলে, সিগারেট পিছনে লুকিয়ে ছাত্ররা বিনয়াবনত নমস্কার করে।

সেই সব অধ্যাপকেরা অতএব আটফুট চওড়া গলির এ-পাশ থেকে কান খাড়া করতে পারেন, বড়জোর হঠাৎ যেটুকু চোখে পড়ে, সেটুকু দেখতে পারেন।

দেখতে পারেন, যে-মেয়েটির নাম ঝিনুক, অন্তত ওই নামে যে সাড়া দেয়, সে সকালে উঠেই একবার পূবের বারান্দায় আসে। তখনও তার শাড়ি অগোছাল, তখনও তার চোখ ফোলাফোলা। সেই চোখ মুছে মুছে সে চাউনিকে সহজ করে, তারপর রেলিংয়ে কনুই রেখে বিস্ফারিত চোখে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে থাকে। কী দেখে সেই জানে। রোজই ভোর হয়, সে জানে, কিন্তু জানে না কেন হয়, তাই রোজই বিভোর হয়ে ভাবে। একটি একটি করে পাখি রাস্তায় ও-পাশের ঝাঁকড়া-চুল দৈত্যের মত দেখতে গাছটার আশ্রয় ছেড়ে

আকাশে উড়ে যায়, ঝিনুক কি তাদের গোণে ! কেন না ঠিক তখনই সে ঘরে ফিরে যায়, যখন আর পাতলা আড়ালের বাসা থেকে একটি পাখিরও উড়তে বাকি নেই।

ঝিনুককে আরও একবার দেখা যায়, খুব কম সময়ের জন্য। মুখটুখ ধুয়ে, সম্ভবত চা-ও খেয়ে, যখন সে ফিরে আসে। তখন দৃষ্টির অস্বচ্ছতা ঘুচে গিয়েছে, সে খোলা জানালার সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়ায়। তারপর রোগা সাদা একটা হাত বাড়িয়ে পর্দা টেনে দেয়। এ জানালাটা পূবমুখী, এখন সকাল, রোদ ঠেকাতে ঝিনুক আবরু রচনা করেছে। জানালার ওদিককার টেবিলে বসে ঝিনুক বোধ হয় পড়া তৈরী করে।

ন'টা অবধি। তখন সে আবার বারান্দায় আসে, হাতে একমুঠো চাল, ছোলা বা খৈ, সেগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে দেয়।

ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা আসে, গোল হয়ে বসে, ঠুকরে ঠুকরে খায়, আবার নিজেদের ঠোকরায়। ওদের যেমন রেষারেষি, তেমন ঘেঁষাঘেঁষি। খাওয়া শেষে সব পায়রা ফের উড়ে যায়। তখন সেই মেয়েটি, ঝিনুক, হাতের তেলো দিয়ে এলো চুল ঘষে।

এখন তার স্নানের সময়, নইলে কাঁধে কেন তোয়ালে থাকবে আর কনুইয়ের ভাঁজে শুকনো শায়া, ব্লাউজ, শাড়ি।

স্নান সেরে সেই মেয়ে আবার ফিরে আসে। অন্য সময় তার যে চুল কাঁপা কাঁপা আর ফাঁপান লাগে, সেই চুলই কালো চুলের মত পিঠে ছড়ান, ভিজে, টান টান, কিন্তু আরও যেন ঘন। শুকনো শাড়িটাই পরণে, কিন্তু পরিপাটি করে পরা নয়, শিথিল করে জড়ানো। চোখ দুটি আরও বিশাল, নিষ্পাপ আর আয়ত। তখন পায়ের ওপর ভর দিয়ে আরও একটু লম্বা হয় ঝিনুক, সামনের তারটায় ভিজে জামা-কাপড় মেলে দেয়।

সে নিজেই তখন আড়ালে পড়ে যায়, সে বোধ হয় চলেও যায়। স্কুলে কিংবা কলেজে। স্বদেশবাবু ঠিক জানেন না। তাঁর নিজেরও তখন কলেজে যাবার তাড়া কিনা।

খুব কাছাকাছি থেকে দেখেছেন মোটে দু' একবার। ট্রাম-ষ্টপে। কথা হয়নি। হওয়া সম্ভব নয়। স্বদেশবাবুর তখন চোখে চশমা, মুখে মুখোস। প্রতিবেশী নতুন ভাড়াটেদের মেয়েটি যে তাঁর চেনা, ভাবলেশহীন মুখে তার আভাস-মাত্র দেখা যেত না।

বরং তাকে বিকেলে দেখতেই ভাল লাগত। ক্লান্ত শরীর আর হেলান চেয়ারটা টেনে স্বদেশবাবু যখন ছোট ছাদটাতে বসতেন। বসতেন আগেও, তখন শুধু এক একটি বিকেলের রক্তাক্ত মৃত্যু আর সন্ধ্যার বিষন্ন জন্ম প্রত্যহ চেয়ে চেয়ে দেখতেন। ঝিরঝিরে হাওয়া দিত, স্বদেশবাবু চোখ বুঁজে ঘ্রাণ নিতেন। যেন চিনতে চাইতেন কোন গন্ধ, কোন ফুলের। দু' একটি সুতো ছেঁড়া ঘুড়ি পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ত, অনেক দূরে বেতারের ভুতুড়ে খুঁটিতে হুঁশিয়ারি জ্বলত। একটি নীলোজ্বল সলজ্জ বিন্দু আকাশের কোণে কাঁপত, তার নাম সন্ধ্যাতারা তারপর হালকা আর ভারী, সাদা আর ধূসর নানা রকমের মেঘে ভর দিয়ে আকাশটাই ধীরে ধীরে নীচে আসত।

আকাশকে যারা স্থির বলে জানে তারা ঠিক জানে না স্বদেশবাবু এটা অনেকদিনই লক্ষ্য করেছেন। এমনিতে টলটলে, নীল, গভীর, তখন যেন অনেক উঁচুতে চলে যায়, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সে ধ্যানমৌন। আবার কখনও চঞ্চল হয়, নীচে নামে, মনে হয় হাত বাড়ালে তাকে বুঝি ছোঁয়া যাবে।

সেই বিকেল আর আকাশ আর ঝিনুক, এই তিনে মিলে এখন এক হয়ে গিয়েছে। কলেজ থেকে ফিরে এসেছে ঝিনুক, অনেকক্ষণ কলঘরে গিয়ে বুঝি গায়ে জল ঢেলেছে। খোঁপা সে বাঁধে না, কিন্তু এই সময়ে চিরুণী টেনে টেনে চুলগুলো সুবিন্যস্ত করে। মুখে পাউডারের হালকা একটি প্রলেপ থাকে, কমলা বা কামরাঙা রঙের শাড়ি পরে। একটু পরিপাটি এখন মেয়েটি। ছাতে উঠে কার্ণিসে হাত রাখ। এই সময়ে তাকে খুব নিঃসঙ্গ লাগে। সে যত কাছের ততই দূরের। ঝিনুক তখন ঘরে ফেরা পাখিদের গোণে। তারা গোণে। ছাদের টবে সতেজ কয়েকটি ফুলের চারা, তাদের পাতা

আলগোছে ছোঁয়, একটি কি দুটি কুঁড়ি তুলে চুলে পরে। তারপর রাত এসে মেয়েটিকে মুছে দেয়, তখন স্বদেশবাবু ওঠেন।

স্বদেশবাবু ঘুলঘুলিটাও বন্ধ করে দিলেন। তাঁর বুক দুরদুর করছিল কান আরক্ত হয়েছিল। পা কাঁপছিল। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল বলে জল খেলেন, কিন্তু জানালার পাশে কে যেন আবার তাঁকে টেনে নিয়ে এল। আবার সন্তর্পণে একটুও শব্দ না করে খড়খড়ি তুললেন।

জোর হাওয়া দিয়েছে বাইরে, ও বাড়ির জানালার পরদা কয়েকবার উড়ে হঠাৎ একটা শিকের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। ওদের ঘরটাই এখন যেন বড় বেসামাল আর বে-আব্রু।

ঘরটা তো নয়, ঘরের ভেতর যে শুয়ে আছে, সে।

রবিবারের দুপুর, নিজের নিরিবিলি ঘরটিতে শুয়ে শুয়ে কী একটা বই পড়ছিল। সে তো আর জানে না, হঠাৎ হাওয়া উঠবে, জানালার পরদাটা করবে বেইমানি, তার বিবশ, বিবেশপ্রায় রূপটি এমন অসতর্ক-ভাবে অন্যের চোখে পড়ে যাবে।

স্বদেশবাবু লজ্জা পেয়েছিলেন। নিজের দিকের জানালাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু খড়খড়ির চোখ বোঁজে না যে। সেটা ধরে টানাটানি করতেও আরও খানিকটা সময় গেল। গড়িয়ে পড়া গ্লাসের জল যেভাবে ঢালু দিকেই বয়ে যায়, স্বদেশবাবুর দৃষ্টিও তেমনি আরও কয়েকবার ওদিকেই—ছিঃ!

কৃশ, নীরব পাণ্ডুর একটি মেয়ে শুধু ক্লান্ত, করুণ আর শিথিল শোবার ভঙ্গিতেই এত সুন্দর হতে পারে! দুটি পায়ের পাতা যেন সাদা দুটি পদ্মফুল। অনাবৃত পায়ের ডৌলটি আবৃত। হাতের বইটি খসে পড়েছে, অসাবধান বুকের ওঠা-পড়ার ছন্দটি এখান থেকেও যেন অনুভব করা যায়। লিকৃলিকে দুটি হাত দেখে যা মনে হয় তত অপুষ্ট নয় তো। এলানো চুলের একটি গুচ্ছ শুভ্র গ্রীবাতটে, যেন সানুদেশের নিকষ কালো নদী।

স্বদেশবাবু নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এলেন। আরও এক গ্লাস জল খেতে হল।

মাথার ওপরের রডটা চেপে ধরেও ঝাঁকুনি সামলাতে পারেন নি স্বদেশবাবু, টলে পড়ছিলেন, আর টাল সামলাতে হল বলেই দেখতে পেলেন।

ঝিনুক নামে মেয়েটিও এই বাসেই আছে। শুকনো মুখ, বোধ হয় কলেজ থেকে ফিরছে। এক হাতে বই, অন্য হাতটা রেখেছে সীটের পিঠে। বসতে হয়নি। লেডীজ সীট খালি নেই একটিও।

আড় চোখে চেয়ে চেয়ে যতটুকু বুঝতে পারলেন স্বদেশবাবু, এভাবে চলা ফেরা করতে মেয়েটি অনভ্যস্ত। রোজই বোধ হয় পায়, আজ পায়নি। আজ ভিড় কিছু বেশি। বিকেল থেকেই গুমোট হয়েছে, বৃষ্টি যেন নামে-নামে। কোঁচার খুঁটে স্বদেশবাবু কপালের ঘাম মুছলেন।

আবার বাস থামল, আবার ঝাঁকুনি খেলেন স্বদেশবাবু, খেতে খেতেই টের পেলেন, আরও লোক উঠল। ঝিনুক মেয়েটি এখনও বসতে পায়নি, কেউ নামেনি, আগের মতই লজ্জিত ভঙ্গিতে একটা সীটের সঙ্গে এক রকম মিশে দাঁড়িয়ে আছে। ওর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এল কত জন, ভীরু বিব্রত মেয়েটাকে কনুই দিয়ে সরিয়ে, হয়ত বা পা মাড়িয়ে সামনে এল। ওরই মধ্যে সূক্ষ্ম দেহধারী আত্মার মত কন্‌ডাক্‌টর চলা ফেরা করছে। মায়া বোধ করলেন স্বদেশবাবু, তিনি নিজেও যে দাঁড়িয়ে, নইলে মেয়েটিকে ডেকে নিজের আসন ছেড়ে দিতেন। যারা বসে আছে, যারা ঠেলাঠেলি করে সামনে আসতে চাইছে, তাদের স্বদেশবাবু মনে মনে তিরস্কার করলেন, 'তোমরা অভদ্র ; তোমরা পশু, তোমরা মেয়েদের প্রাপ্য সম্মান দিতে জান না।'

কালো বলিষ্ঠ লোকটাকেও তিনি কিছুক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিলেন। কোথায় ছিল কে জানে, লোকটা একটু একটু করে এগিয়ে ঝিনুকের

পিছে এসেছে, পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। পরণে হাফ শার্ট, বুকের বোতাম খোলা, চুল ফেরানো মাথা, একটু লাল্‌চে চোখ, কিন্তু বড় বড়। ঝিনুকের কাঁধের আঁচল এই ভীড়ে সামান্য সরে গিয়েছে, লোকটার লুব্ধ একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ সেখানেই; যেখানে দু'টি বিনুনি-প্রবাহের প্রয়াগ।

ঝিনুকের হাত সীটের যেখানে, লোকটা সেখানেই হাত রাখল। ঝিনুক হাত সরিয়ে নিল। কপালে ঘামের ফোঁটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, শুধু গরমে বোধ হয় নয়, অস্বস্তিতে। স্বদেশবাবু একবার যেন শুনতে পেলেন, ঝিনুক অস্ফুট গলায় বলে উঠল, 'উঃ'! এদিক ওদিক চাইল। ওই বদমাসটা কী করেছে, পায়ে চাপ দিয়েছে নাকি মেয়েটার? স্বদেশবাবুর কপালের রগ দুটি স্ফীত হয়ে উঠল। অসহায় মেয়েটি কাউকে কিছু বলতে পারছে না। মুখ বুঁজে সয়ে যাচ্ছে, এখনও কি তাঁর পোষাকি ভদ্রতার মুখোস এঁটে রড ধরেই ঝুলতে থাকবেন স্বদেশবাবু? প্রবীণ প্রতিবেশী হিসেবে, সুস্থ নাগরিক হিসেবে তাঁর করণীয় কিছু কি নেই।

রড ছেড়ে স্বদেশবাবু আস্তে আস্তে পিছিয়ে আসতে চেষ্টা করলেন।

তারপর কী ঘটেছিল ঠিক মনে নেই। টাল সামলাবার ছুতোয় দুঃসাহসী লোকটা বুঝি ঝিনুকের কাঁধেই হাত রেখেছিল। কখন থর থর রাগে স্বদেশবাবু তার গালে এক চড় বসিয়ে দিয়েছেন। কিচ্ছু খেয়াল নেই। দাঁতে দাঁত চেপে বোধ হয় বলেছিলেন, 'অসভ্য বর্ব্বর, পশু।' দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন, প্রৌঢ় বয়সের ভারসাম্য, সংযম কিচ্ছু ছিল না।

মনে আছে, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ একটা হৈ-চৈ হয়েছিল। বাসশুদ্ধ লোক কী করে পলকে ব্যাপারটা টের পেয়ে গিয়েছিল। আরও কিল চড়, ঘুষি এই লোকটার বুক, পিঠ মাথা লক্ষ্য করে এক পশলা ঝড়-বৃষ্টির মত ভেঙ্গে পড়ল। একজন বলল, পুলিশে দাও, আর এক

জন বলল, পুলিশে কাজ কী, আমরাই উচিত মত শিক্ষা দিচ্ছি ওকে, মেয়েদের গায়ে হাত দেবার সুখ পেয়েছে, এবার ধোলাই কাকে বলে জানুক, সুখের সুদটুকুও পেয়ে যাক। একজন লোকটার চুলের মুঠিও ধরেছিল।

তবু লোকটাকে বাহাদুর বলতে হবে, মাথা নীচু করে কয়েকটা মার এড়িয়ে গেল, এবং সমবেত আক্রমণেও বিহ্বল বা বুদ্ধিভ্রষ্ট হল না। পিছলে সরে সরে একবার চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে পড়ল। যাত্রীরা চেঁচিয়ে বললেন, ধর, ধর, পালায় যে, এই কনডাকটর বাঁধকে। কিন্তু গাড়ি বাঁধল না, নামতেও গেলেন না কেউ, সকলেরই তখন বাসায় যাবার তাড়া। একটা গলির মধ্যে লোকটা পলকে অদৃশ্য হল।

স্বদেশবাবু হাঁপাচ্ছিলেন। বাস থেকে নেমেছেন বাসার কাছাকাছি ষ্টপে, মেয়েটিও নেমেছে। এতক্ষণ ও একটি কথাও বলেনি। বসবার একটু জায়গা পরে পেয়েছিল। এক কোণে আড়ষ্ট হয়ে ছিল। কোলের বইয়ে লুকিয়েছিল মুখ।

একটু দাঁড়ালেন স্বদেশবাবু, আসুক, ও আসুক, আজ ও উত্তেজিত, ভীত, বিব্রত, আজ এই রাস্তাটুকু ওর সঙ্গে সঙ্গে কারুর থাকা ভাল।

ওর দিকে একবার চাইল ঝিনুক, পরক্ষণে চোখ নামাল। স্বদেশবাবু দেখলেন, তখনও ওর গালে ছোপছোপ লাল, পায়ের পাতায় শাড়ি কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছে।

'তুমি তো আমাদের পাশের বাসাতেই থাক?' স্বদেশবাবুই প্রথমে কথা বললেন, 'তোমরা নতুন এসেছ, না?'

ঝিনুক ঘাড় কাত করে জানাল, 'হাঁ!'

'আজ খুব বেঁচেছ', স্বদেশবাবু আবার বললেন, গলাটা পরিষ্কার করে, 'মেয়েদের একলা চলাফেরা করায় সত্যিই অনেক বিপদ। কত ভদ্রবেশী শয়তান যে লুকিয়ে থাকে। একটু সুযোগ পেলেই—'

'আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন', ঝিনুক বলল নম্রস্বরে, কালো কৃতজ্ঞ দুটি চোখ তুলে।

উৎসাহিত হয়ে স্বদেশবাবু বলে চলেছিলেন, 'না না, এমন আর কী। ওটুকু তো আমার কর্তব্য। যাক, জানোয়ারটা আচ্ছামতন সাজাই পেয়েছে।'—বলতে বলতে হঠাৎ থমকে গেলেন। মেয়েটির চোখে নিজের ছায়া হঠাৎ দেখতে পেয়ে চমকে গিয়েছেন। স্বদেশবাবুর মুখের সব রক্ত কেউ যেন নিমেষে শুষে নিল।

মুখে আর কথা ফুটল না, স্বদেশবাবু মনে মনে বললেন, 'কাকে জানোয়ার বলছি। আমিও কি লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে কতদিন দেখিনি!' ঝিনুক যেদিন অসতর্ক অগোছাল হয়ে ঘরে ঘুমিয়েছিল, সেদিনের কথাও মনে পড়ল। সেদিন তিনি চোখ ফেরাতে পারেননি। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে এক মুহূর্ত তো দেখেছেন। পলকের দুর্বলতা, কিন্তু সেটাও গুপ্ত চৌর্যই।

'আজ', স্বদেশবাবু আবার ভাবলেন, 'আজ এখন ও থরথর করে কাঁপছে, বিকেলের ঘটনাটা ওর স্নায়ুগুলোকে নাড়া দিয়েছে, আমার ইচ্ছে আশ্বস্ত করবার জন্যে ওর কাঁধে একটিবার হাত রাখি, ভীরু মেয়েটিকে ওর সাহস ফিরিয়ে দিই। কিন্তু পারছি না। ভয় করছে, ভরসা পাচ্ছি না। বাসের ওই লোকটা ওকে ছুঁতে চেয়েছিল, পেরেছিল। আমিও মনে মনে কতবার ওকে স্পর্শ করতে চেয়েছি, সাহস পাইনি।'

তফাৎ এইটুকু, শুধু কি এইটুকু? ভদ্র নাগরিক, সৌম্য প্রৌঢ়প্রায় অধ্যাপক চমকে উঠলেন।

* * *

ঘরে ফিরে সেদিন ডায়েরির পাতা খুলে স্বদেশবাবু ঘটনাটি লিখে রেখেছিলেন। কোন কথাটি দিয়ে শেষ করবেন, কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলেন না, অনেক ভেবে শেষে খসখস করে লিখেছিলেন, 'আমরা অনেকেই সচ্চরিত্র যেহেতু কাপুরুষ।'

অনেক লিখে লিখে যখন ক্লান্তি আসে, তখন, যে-সব গল্প এখনও লেখা হয়নি, সে-সবের কথা ভাবি। কয়েকটার কাঠামো তৈরি করে রেখেছি। কিন্তু কাঠামো আর প্রতিমা এক নয়। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু অন্ততঃ খড়-মাটি আর রঙের প্রলেপ তো চাই।

তবে গল্প যদি না-ও হয়, তবু তার খসড়াটা অন্ততঃ লিখে দিতে পারি। তাতে ভাবনার ভার হালকা হয়, কায়িক শ্রমও বাঁচে।

নীলিমাকে নিয়ে যে-গল্পটা ভেবে রেখেছি, তার খসড়াটা এই রকম ঃ

রোজই বিকেলে গা ধুয়ে নীলিমা ধোয়া একটা শাড়ি পরে কপালে কুঙ্কুমের ফোঁটা দিয়ে মনে মনে বলে, 'এই যে আমি টিপ পরলুম, তোমারই কথা ভেবে। আমি যখনই যেটুকু সাজ করি, তোমার চোখে সুন্দর হব বলে।'

ঘড়িটার দিকে চেয়ে বলে, 'ছ'টা বাজল। তুমি এইবার আসবে। এই তো, সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ শুনছি। তুমি নেমে যাও তাড়াতাড়ি, ওঠ আস্তে আস্তে। একটা একটা করে ধাপ ভেঙে ভেঙে ওঠ, আমি শুনি। এক, দুই, তিন, চার,···আঠার, উনিশ, কুড়ি। তুমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছ, এইবার কপাটে টোকা দেবে। আমি বলব, এস।'

কপাট ফাঁক করে ঘরের ভিতরে একবার উঁকি দিয়েই রজত মাথা টেনে নিল।

নীলিমা বলল, 'আসছ না যে? ন-যযৌ হলে কেন।'

ফিসফিস করে রজত বলল, 'তোমার স্বামী নেই?'

নীলিমা হেসে ফেলল দেখে, 'নেই, নেই, নেই! তুমি তো জান, এই সময়ে সে কোন দিন থাকে না। টুইশনি করে, নয়তো লাইব্রেরিতে যায়।'

রজত তখনও পাপোষে জুতো ঘষছে।

নীলিমা বলল, 'তোমার চোর-চোর ভাব গেল না।'

রজত ভিতরে এসে বসল, বিছানায়, পা ঝুলিয়ে। হাত বাড়িয়ে রেগুলেটর ঘুরিয়ে দিল। ঘামটা মরুক, গেঞ্জিটা শুকোক, সে আবার তার সাহস, পৌরুষ, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি ফিরে পাবে।

ফিরে পেলও। উঠে গিয়ে ফুলদানি থেকে একটি চাঁপাফুল তুলে নিল, নাকে ধরল, শেষে পরিয়ে দিল নীলিমার চুলে। পুরনো কথার জের টেনে বলল, 'কী বলছিলে যেন তখন? চোর-চোর ভাব, না কী যেন? তা চোরই তো। কাজটা তো চুরিই। না বলিয়া পরের দ্রব্য নেওয়াকে কী বলে?'

সকোপ ভঙ্গিতে চেয়ে নীলিমা বলল, 'আমি বুঝি একটা দ্রব্য।'

'না, স্ত্রী—পরস্ত্রী'

রজতের গালে আলগোছে টোকা দিয়ে নীলিমা বলল, 'পরস্ত্রী-হরণ কি চুরি? বাহাদুরি।'

অতএব রজতকে একটু বাহাদুরিই করতে হল। নীলিমাকে খাটের কাছে টেনে এনে বলল, 'ব'স।' কোলে মাথা রেখে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

নীলিমা বলল, 'আগে মুখে রা ছিল না। চোর থেকে একেবারে ডাকাত? যদি ও এখুনি এসে পড়ে?'

'তোমার স্বামী?' শূন্যে দৃষ্টি আস্ফালন করে রজত বলল 'ভয় করিনে।'

ঘুম পাড়ানি ভঙ্গিতে ওর কপালে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নীলিমা বলল, 'খুব বাহাদুর। থাক আর বীরত্ব দেখিয়ে কাজ নেই, চুপচাপ শুয়ে এবার ঘুমোও দেখি।' আর অবাধ্য শিশুর মতই রজত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আমি কি এখানে ঘুমতে এসেছি?'

নীলিমা মুখ টিপে হেসে বলল, 'তবে কেন এসেছ?'

উত্তরটা রজত মুখে দিল না। খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নীলিমা, কপাল লাল, আঁচল কুড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'বেশী দুষ্টুমি করলে কিন্তু মাষ্টারমশাইকে বলে দেব।'

'মাষ্টারমশাইকে বলে মার খাওয়াবে?' সিগারেট ধরিয়ে জোরে জোরে ধোঁয়া টেনে রজত হাসতে থাকল।—'মাষ্টার মশাই এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তোমার স্বামী। আমি ঠিক জানি নীলিমা, অসীমবাবু আসবেন না।'

'এত নিশ্চিন্ত হলে কিসে?'

'কোনদিন আসেন না বলে। দু' মাস ধরে প্রায় রোজই ত আসি, কই একদিনও ত এ-সময়ে ওঁকে দেখলাম না? সত্যি নীলিমা, মাঝে মাঝে ভদ্রলোকের প্রতি শ্রদ্ধা হয়, শুধু এই কারণে—তাঁর এই বিবেচনার জন্যে।'

নীলিমা ঈষৎ গম্ভীর হয়ে গেল।—'ঠাট্টা ক'র না। এ সময়ে আসবেন কোথা থেকে। সারা দুপুর অফিসে খাটেন। বিকেলে তিনদিন টুইশন। বাকি ক'দিন লাইব্রেরিতে পড়াশোনা। জান, উনি আরেকটা সাবজেক্টে এম এ দিচ্ছেন। তা হলে নাকি লিফট্ পাওয়া যাবে। যদি ঘুণাক্ষরেও জানতেন, সেই সময়ে—' কথাটা শেষ করতে গিয়ে নীলিমা থেমে গেল, যেন লজ্জা পেল, নখে নখ ঘষতে থাকল, যেন নখের রঙে ওর লজ্জাটা মাখান আছে ঘষলেই সেটা দূর হবে।

কিন্তু সেই রঙ-মাখা আঙুলই রজত টেনে নিল ওর হাতে। বলল, 'যদি জানতেন, সেই সময় তাঁর পতিব্রতা পত্নী—'

একটা চিমটি কেটে নীলিমা বলল, 'ফের ইয়ার্কি?'

রজত শুনল না, বলে গেল, 'তাঁর পতিব্রতা পত্নী ঘরে অন্য লোক ডেকে আনে—' 'ডেকে আনে না, সে নিজে আসে।'

'বেশ সে নিজেই না হয় আসে, কিন্তু তাকে বসতে কে দেয় পিঁড়ে? খেতে দেয় শালিধানের চিঁড়ে?'

'এই মিথ্যেবাদী, কবে দিয়েছি?'

'আচ্ছা, বেশ দাওনি। কিন্তু প্রশ্রয় ত দিয়েছ? যদি তোমার স্বামী জানতেন, তিনি তবে কি করতেন, নীলিমা? সন্ধ্যাবেলা রোজ ঘরে এসে বসতেন? চোর ঠেকাতেন লাঠি হাতে, তাঁর প্রপার্টি পাহারা দিতেন?'

'আমি কারও প্রপার্টি নই,' নীলিমা বলল, 'যা করছি নিজের ইচ্ছে আর পছন্দ আর প্রবণতা অনুসারেই করছি। ভাল মন্দ বেছে নেবার অধিকার আর ক্ষমতা দুই-ই আমার আছে।'

একটু বুঝি উত্তেজিত হয়েছিল নীলিমা, হাঁপাতে থাকল। পকেট থেকে রুমাল বের করে রজত মুছিয়ে দিল ওর কপাল। বলল, 'এত যখন বোঝ, তখন আর ভাবছ কেন। সত্যিই ত সে-সব দাসী প্রভু টভুর কাল এখন আর নেই। সে-কালে স্বামীদের জোর ছিল। বেশীটাই গায়ের জোর। দরকার হলে এ সব ক্ষেত্রে শায়েস্তা করতে বউয়ের গায়েও নাকি হাত তুলতেন—'

ফোঁস করে উঠল নীলিমা।—'হাত তুলতে আমিও জানি।'

ওর পুষ্ট মণিবন্ধের দিকে এক নজর চেয়ে রজত বলল, 'আর গ্রামাঞ্চলে কী হত জান? স্ত্রীর প্রণয়ীরা গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ দিত।'

'মিডীভ্যাল বর্বরতা। তাতে বুঝি সম্মান বাঁচত, স্ত্রীর মন ফিরত?'

একটি আঙুল দিয়ে নীলিমার কণ্ঠনালী ছুঁয়ে রজত বলল, 'তোমাদের মনের খবর তোমরাই জান। বিদেশে কিন্তু এ-দিয়ে অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী পিস্তল হাতে ডুয়েল লড়েছে—'

'নজীর এ-দেশে নাই বুঝি? জগৎ সিংহ আর ওসমান—' মুখে আঁচল তুলে নীলিমা হাসল।—'কিন্তু এখন? সব অচল। এ কালের মেয়েদের মারের ভয় নেই, কেননা তারা অবলা নয়। স্বামী পরিত্যক্তা হতে ভয় নেই, তারাও রোজগার করে।

'আর?' রজত মিটিমিটি হাসল।

'আর, তাদের নিজেদের মন জানে। ধমকে বল, চোখের জলে বল, টলে না। মন যা চায় তাই করে।' বলতে বলতে সুন্দর একটি ভঙ্গি করে বিছানায় মাথা রাখল নীলিমা, যেখানে রজতের একটা হাত অলস হয়ে পড়ে ছিল, তারই কাছাকাছি।

আস্তে আস্তে ন'টা বাজে। রজত উঠে বসে। হাই তোলে। চিরুনি দিয়ে ওর মাথার চুল নিজের হাতেই ঠিক করে দিতে দিতে নীলিমা বলে, 'বাস, এবার লক্ষ্মী ছেলের মত ঘরে ফের। কেমন?'

জুতোয় পা গলাতে গলাতে রজত অদ্ভুত চোখে তাকায়। বলে, 'যেতে পা সরে না, মন সরে না। যদি না যাই? যদি থেকে যাই?'

ইঙ্গিতটাকে ফলিত না করে নীলিমা ওকে ঠেলতে ঠেলতে আনে দরজা অবধি। বলে, 'পালাও, উনি এসে পড়লেন বলে।'

একটা লোভ রজতের চোখে আলেয়ার মত কাঁপে।—'নীলিমা এমন কি হয় না, যেদিন তোমার স্বামী এলেন না, আসতে পারলেন না? আমারও অতএব ফেরা হল না। রোজ নয় প্রায় নয়, একটি দিন—মোটে একটি দিনও কি সে সুযোগ পাব না?'

'অসভ্য!' নীলিমা বলে ওঠে, সশব্দে বন্ধ করে দেয় দরজা।

একজোড়া জুতো দ্রুত নীচে নেমে যায়, আরেক জোড়া ওপরে উঠে আসে, পরে, আরও পরে! খুব ক্লান্ত ভাবেই অত্যন্ত সসঙ্কোচে।

মাঝের এই সময়টুকু নীলিমার হাতে কোন কাজ থাকে না। এক-বার গিয়ে রেডিওটা খুলে দেয়, গান শোনে। ভাল লাগে না, কেন যে রজত ওটাকে এখানে রেখে গেছে কে জানে। ওটা নিয়ে কম মিছে কথা তৈরি করতে হয়নি নীলিমাকে। স্বামীকে বলেছে, জিনিসটা তার এক বান্ধবীর, ছুটিতে বেড়াতে গেছে, নীলিমার হেফাজতে সখের জিনিসটা রেখে। কিন্তু সেও তো আজ সাত মাস হয়ে গেল, এখনও জিনিসটা ফেরত যায়নি। স্বামী যদি জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার বন্ধুর ছুটি কি এখনও ফুরায়নি?' নীলিমা কী বলবে।

মনে মনে কী বলবে তার মহড়া দেয় নীলিমা, সাহস সঞ্চয় করে। বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, আকাশে মেঘে মেঘে যোগবিয়োগের খেলা দেখে আর বলে, 'ভয় কী! কিসের ভয় আমার! যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে বলব; যা সত্যি তাই বলব। বলব রজত দিয়েছে।'

'যদি বলে, রজত আসে কেন? বলব, আসবেই বা না কেন। আমার বউদির ভাই, ওর সঙ্গে আলাপ যে অনেক দিনের। আমাদের বিয়ের ঢের আগে থেকেই। আমরা বন্ধু। শুধু বন্ধু।'

'শুধু' শব্দটি নীলিমা বলে একটু জোর দিয়ে। শুধু বন্ধু? বন্ধুই তো। আমরা একটি সুন্দর সম্পর্ককে আজও টিকিয়ে রেখেছি। তাকে ঘর গৃহস্থালীর ধোঁয়ায় ধুলোয় কালো করে ফেলিনি।

যদি অসীম, ওর স্বামী, বলে, 'কিন্তু তোমরা যা করছ, তা যে অন্যায়।' নীলিমা বলবে, 'তোমার আর আমার ন্যায়ের মাপকাঠি এক নয়।'

তবু মানুষটা যখন অনেক রাতে ঘরে ফেরে, চাপা দেওয়া ভাত চুপ করে খেয়ে যায়, তখন নীলিমার বুক দুরদুর করে, কাল্পনিক মহড়ার সংলাপ কিছুমাত্র মনে পড়ে না। ভয়ে ভয়ে নীলিমা ঘরের চারদিকে চোখ বুলায়। না, কোথাও সিগারেটের টুকরো পড়ে নেই, বিশৃঙ্খলা বা অসাবধানতার চিহ্ন নেই এতটুকু। আসবাব থেকে শয্যা অবধি

প্রত্যেকটি বস্তু যথামত, যথাস্থানে। শুধু ফুরফুরে একটু গন্ধ লেগে আছে ওর নিজেরই আঁচলে, কিন্তু আতর তো নীলিমা নিজের জন্যেই একটু মাখতে পারে। কুঙ্কুমের টিপটা আছে এখনও। দোষ কী, এয়োস্ত্রী যে, তার টিপ পরায় দোষ কোথায়।

খাওয়া সেরে অসীম শুয়ে পড়ে বিছানায়। আস্তে জিজ্ঞাসা করে, 'কেউ কি এসেছিল?'

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মুহূর্তের জন্যে যেন রুদ্ধ হয়, নীলিমা বলে, 'না, কই, না ত?'

'কেউ আসেনি?' তেমনি ক্লান্ত আর হতাশ ভঙ্গিতে অসীম বলে, 'জোন্‌স্ মরিস্‌নে কাজের চেষ্টা করছি, আজ যে ওদের খবর দিয়ে যাবার কথা ছিল।'

নীলিমা স্বস্তি পায় তখন। জানে না, লোকটা জানে না। কিছু টের পায়নি। কিছুমাত্র সন্দেহ করেনি।

অতি ধীরে, অতি নিয়মিত তালে অসীমের শ্বাস পড়ছে। সারা দিনের ক্লান্তির পর নিমেষে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নীলিমার বুকের ভিতরটা তখনও কাঁপে—ভয়ে নয়, মমতায়। সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে, তার প্রতি গভীর মায়ায় মন ছেয়ে যায়।

কিন্তু মায়া আর ভালবাসা তো এক নয়। দ্বিতীয়টি আছে যার জন্যে, তার কথা ভেবে নীলিমা বেলা পড়তে নিজেকে যে একটু সুন্দর করে তুলবেই, আঁচলে সুরভি ঢালবে, সযত্নে পরবে টিপ, চোখে অপরূপ ভ্রূভঙ্গি আনবে।

অসীম ঘরে ঢোকেনি। চৌকাঠে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওরাও টের পায়নি। খুব কাছাকাছি বসেছিল। খুব নিচু গলায় কথা বলছিল।

একবার বা কি কথায় রজত হো হো করে হেসে উঠল। আর তখনই নীলিমা চমকে চাইল পিছনে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মত সে ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় রজতকে চুপ করতে বলল।

দেখল রজতও। দু'জনের মুখই পলকে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সহজাতবোধের ইঙ্গিতেই দু'জন ছিটকে বসেছে দু'দিকে।

অসীম তখনই ঘরে ঢুকল। কোন দিকে না চেয়ে গায়ের জামাটা ছাড়ল। পরল আর একটা। কোন কথা নেই। বেপরোয়া ঘড়িটা ছাড়া কেউ কথা বলছে না। নীলিমা পাংশু, ভীত, বিবর্ণ। আড়চোখে দেখছিল অসীমকে। ওর মুখের কোন রেখার পাঠোদ্ধার করতে পারে কিনা। রজত দেয়ালে কত ছোট্ট ফুলগুলি কত বড় ছায়া ফেলেছে, একদৃষ্টে তাই দেখছিল। সেই ছায়া আর একজন দেখছে, টিকটিকি। আরেকটু পরে টিকটিকিটা ফুলের ছায়াকে ফুল বলে ভুল করে ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি—ভয়ে বিহ্বল রজত, ভাবছিল।

না—না এই ভয় কোন কাজের কথা নয়। নীলিমা হঠাৎ মনস্থির করে ফেলল। এই সময়ে সাহস হারালে চলবে না। হারালেই আবার স্বামী পেয়ে বসবে, হয়ত হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

খুক্‌-খুক্‌ করে খানিকটা কেসে দেখল গলার স্বর ঠিক আছে কি না। বলল, 'তোমাদের আলাপ নেই বুঝি? আগে কোন দিন দেখাও হয়নি? কী আশ্চর্য, অথচ রজত তো এখানে প্রায়ই আসে!'

ব্রজনাথবাবু, আপনার গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার আর প্রয়োজন নেই, ফিরে আসুন। জানি না ত, আপনি এখন কোথায়, আপনার ঠিকানা কী, অগত্যা তাই বেতারের শরণাপন্ন হতে হল। অবিশ্যি খবরের কাগজেও বিজ্ঞাপন দিতে পারতুম। কিন্তু নিরুদ্দেশের কলমটা আপনার চোখে পড়ত কিনা কে জানে। তাছাড়া, আপনি ত ঠিক নিরুদ্দেশ নন! ইচ্ছে করে, হয়ত সঙ্কোচবশত, গা-ঢাকা দিয়ে আছেন।

কিন্তু গা-ঢাকা দেবার কোন দরকার ছিল না। আপনি নিজে গা-ঢাকা দিয়েছেন কিন্তু আমাদের চোখে ধুলো দিতে পারেননি। আপনার ধারনা, পেরেছেন। আপনার ইচ্ছে, লক্ষ্মীপুজোর ঠিক পর দিনই আমাদের আড্ডায় এসে হাজির হবেন, হাতে হয়ত একটা সুটকেস থাকবে, বলবেন, এই ত ভাই, রাজগীর থেকে ফিরলুম। স্টেশন থেকে সোজা এখানে আসছি। না, না, বসব না, বাসায় যেতে হবে, চান করব, দেখছ না জুতো ভর্তি ধুলো, চুল উশকো-খুশকো, চোখ লাল। ট্রেন জার্নির ধকল সোজা নাকি? বাব্‌বাঃ, এখন বাড়ি গিয়ে বিছানায় টানটান হয়ে একটানা ঘুম দেব। কাল সকালেই ত আবার অফিস? রাজগীরের গল্প তোমাদের শোনাব বইকি, কাল সন্ধ্যাবেলা এসে শোনাব।

আমরা হয়ত ছাড়ব না, বলব, না ব্রজদা, দশ মিনিট বসে যেতেই হবে। পুজোর ছুটি বাইরে কাটিয়ে এলেন, আপনি ভাগ্যবান। আমাদের অন্তত গল্প বলুন? কেমন ভীড় হয়েছিল এবার রাজগীরে? আপনার বাসাটা কেমন ছিল, ভাড়া কত। তখন হয়ত ব্রজদা, আপনি পকেট থেকে একটা কাগজ বের করবেন। কিছুটা প্রীত চোখে, সেই চোখে করুণা মিশিয়ে, আমাদের দিকে তাকিয়ে কাগজটা জোরে জোরে পড়তে শুরু করবেন। কাগজ ত নয়, ওটা আসলে

কবিতা, সম্ভবত সনেট, চার পাহাড়ের বর্ণনা। বেশ আবেগ দিয়েই আপনি পড়বেন, গলাটা আমাদের অফিসের লিফ্‌টটার মত ওঠা-নামা করবে। আমরা তন্ময় হয়ে শুনব। শুনব, আর আপনাকে হিংসে করব।

প্রত্যেক বছর যেমন করেছি। গত বছর আপনি আমাদের পুরীর সমুদ্রের বর্ণনা শুনিয়েছিলেন। সেটা অবশ্য কবিতা নয়, ডায়েরির ধরনে লেখা। প্রতিদিনের ছোট-ছোট অভিজ্ঞতা দিয়ে ভরা। কুলীর সঙ্গে স্টেশনেই কী খিটিমিটি হল, হোটেলের ম্যানেজার কেমন সুজন, কবে সমুদ্রে নাইতে গিয়ে একটু নাকানি খেয়েছিলেন, পরে নুলিয়ারা আপনাকে টেনে তোলে, কোন খবরই বাদ দেননি। এমনকি, বিকালের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছিলেন, সূর্যাস্তের শোভার কথাও ছিল, আর সবচেয়ে শেষে বালু-বেলায় একটি মেয়ের সঙ্গে কী করে আলাপ করলেন, সে কথাও লিখেছিলেন। এই অংশটাও রোমান্টিক—আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলাম। সেই মেয়েটি ছিপছিপে, শ্যামলী, তার চোখ দুটি আয়ত। সে নিঃসঙ্গ—অন্তত সেদিন, সেই সময়ে তার কোন সঙ্গী ছিল না। সে ঢেউ গুণছিল, কিংবা ঝিনুক কুড়োচ্ছিল, আপনি কী লিখেছিলেন এখন ঠিক মনে পড়ছে না। তার সঙ্গে আলাপেরও খানিকটা নমুনা ডায়েরিতে দিয়েছিলেন। তাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যখন নিজের হোটেলে ফিরে এসেছেন, তার অনেক আগেই সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে, আপনার হোটেলের জানালায় তখন মৃদু হাওয়া, আপনার মনের মধুর একটু স্মৃতি।

তার নাম জেনেছেন, তার কলকাতার ঠিকানা নিয়েছেন। আমরা শুনেছি, সেই মোহের কিছুটা ভাগ নিয়েছি, আর—আর, আপনাকে হিংসে করেছি।

তার আগের বারের পুজোয় তো আপনি দার্জিলিঙের পটভূমিকায় একটা গল্পই লিখে ফেলেছিলেন। সে-গল্প বিশেষ উচ্চশ্রেণীর নয়, বর্দ্ধমানের নবাবপুত্রীর দুরাশার আভাসমাত্রও তাতে ছিল না, হয়ত নানা গঠনমূলক ত্রুটি, শিল্পনৈপুণ্যের ঘাটতি, এবং মনস্তত্ত্বগত ভুল

ছিল। কিন্তু ভৌগোলিক ভুল একটিও ছিল না, অন্তত আমাদের ভালই লেগেছিল। আপনার এ-সব রচনা ত কোন পত্রিকায় ছাপা হবে বলে লেখা নয় ব্রজবাবু, আমাদের মতই জনকয় অন্তরঙ্গ লোককে পড়ে শোনাবার জন্যে লেখা। আমাদের ভাল লাগল, আমরা ওই যে মনোযোগ দিয়ে শুনলুম, তাতেই আপনার পুরস্কার পাওয়া হয়ে গেল। আপনি লেখাটা মুড়ে পকেটে রাখলেন। তার আগে আমরা ফরমাস করে ফিরে ফিরে কয়েকটা ছত্র আর অনুচ্ছেদ শুনে নিয়েছি। অবজার্ভেটরি হিলে ব্রাহ্মমুহূর্তে আপনার আত্মোপলব্ধির কথাটা। সেই কয়েকটি লাইন আমাদের মনেও রসাবেশ এনেছে। আমরা, পরোক্ষভাবে হলেও, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্বাদ পেয়েছি।

আর, ব্রজবাবু, মনে মনে আপনাকে হিংসে করেছি।

আপনি, শ্রীব্রজনাথ লাহিড়ি, জোসেফ হিলটন কোম্পানির সামান্য কর্মচারী, মাস গেলে মাত্র দেড়শো, টাকা পান, তবে ব্যাচেলর বলে তাতেই এক রকম কুলিয়ে যায়, হয়ত-বা কিছু জমেও। যা জমে তাই দিয়ে বছর-বছর পুজোর ছুটিতে হাওয়া খেতে বাইরে যান। আর আমরা, কম বয়সে বিয়ে-থা করে যারা সংসারী হয়ে পড়েছি, একেবারে নিতান্ত কম আয় নিয়ে নানা দায় আর দায়িত্ব মেটাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছি, আমরা আপনাকে ঈর্ষা করেছি। কেননা, ছুটিতে আপনি বাইরে যান। আমরা বাইরে যেতে চাই, পারিনে। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা সহজে কোথাও যাইনে, এই শহর ছেড়ে সহসা পাদমেক নড়িনে। সাধ যদি হয় কখনও—কোনদিন, যদি সে বুকের ভিতরে অবুঝ শিশুর মত নড়াচড়া করে ওঠে, তাকে অভাব নামে জুজুর ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখি। বলি, ছিঃ, দেখছ না এ-মাসে ওষুধের বিল কত বেশি, এ-মাসে কি ও-সব শখ-আবদারের কথা তুলতে আছে? সব যদি ভালমত থাকে তবে আসছে বছর—আসছে বছর ঠিক আমরা বেড়াতে যাব। হ্যাঁ, পুজোতেই। হিল্লী-দিল্লী না হোক, সাঁওতাল পরগনায় একবার উঁকি দিয়ে আসতে বাধা কী। শিশুর মত অবুঝ সেই সাধটা তখন মনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ত।

আমরা টাইম-টেবিল নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম, মনে মনে মধুপুরা যেতাম, দুধের সাধ মেটাতাম ঘোলে।

ব্রজনাথবাবু, একলা আপনি নন। অন্তত আমরা জানতাম, আপনি নন। আমরা আগেকার মত ধোঁয়া ধুলো আর কালিতে ঢাকা সেই শহরে নিত্য ঠেলাঠেলি করে যখন হয়রান হচ্ছি, ঠাসাঠাসি হয়ে বাস করে হাঁপিয়ে উঠছি, তখন আপনি হয়ত সমুদ্রের ধারে কিংবা কোন পাহাড়ে। সেই সব মনোহরণ বর্ণনার প্রতিটি ছত্র আমাদের মনে পড়ে যেত। আমরা রাগ করতাম আপনার ওপর, খানিকটা ক্লীব, অক্ষম ধরনের। রাগ করতাম আমাদের ওপর। আমরা কেন এমন পারি না। আমরা কেন সারাক্ষণ, প্রতিটি দিন ইঁট-কাঠ, লোহায়-পাথরে গাঁথা এই শহরটার কাছে বাঁধা পড়ে আছি! আমরা নিজেদের ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

ব্রজনাথবাবু, সেই শ্রদ্ধার খানিকটা আমরা যেন আবার ফিরে পেয়েছি। আপনার ওপর আমাদের আর কোন রাগও নেই। আপনাকে আমরা এখন বরং করুণা—হ্যাঁ, করুণাই করছি।

যেখানেই থাকুন, আপনি বেরিয়ে আসুন। আর লুকোনর প্রয়োজন নেই। আমরা নিঃসংশয়ে জানি কিনা, আপনি এই শহরেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছেন।

কী করে জেনেছি, সেটা আপনাকে বোঝাতে হলে, দু'একটা পুরনো কথা বলতে হয়।

আপনার মনে আছে ব্রজনাথবাবু, এবারও শ্রাবণের শেষে আকাশের ঢাকনাটা কে মেজে ঘসে একেবারে নীল করে দিল, মাঝে মাঝে বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে সেই নীলেই আমরা ক্ষণে ক্ষণে কাঁচা সোনার আভাস দেখে চমকে উঠলুম, আমাদের মন খারাপ হয়ে গেল, প্রতিবারই হয়। আমরা একবার আকাশের দিকে চেয়েই টের পেলুম, পূজা কাছে এসে পড়েছে। প্রতিবারই টের পাই। আমরা ক্যালেণ্ডারের দিকে চাইলুম, তার পাতা হাওয়ায় উড়ছিল,

সারি সারি কয়েকটা লাল হরফ আমাদের মনের গোপন ইচ্ছাটুকুর মত টকটকে হয়ে জ্বলছিল। ছুটি এসে পড়েছে। তারপর শ্রাবণ কেটে গিয়ে ভাদ্র এল, ভাদ্রের পর আশ্বিন, বুকের ভিতরে তখন দুরুদুরু করে কাঁপছে, সেই ছেলেবেলাকার সব পূজার স্মৃতি, তার আনন্দ আর বেদনার ফেনা আর ঢেউ নিয়ে যেন আছড়ে পড়ল। বছর-বছর পূজা আসে, এবারও এসেছে। এসেছে কাজ থেকে কয়েকটা দিনের ছুটি। এই সময়ে নানা জিনিস কেনাকাটার ভীড়, দোকানে দোকানে সাজান পসরা, ইস্টিশনে ভীড়। ওরা বেড়াতে যাবে, যাদের সাধ আর সাধ্য দুই-ই আছে। কিন্তু আমরা কোথাও যাবনা, দুরন্ত একটা ইচ্ছা আঁচড়ে কামড়ে মনের ভিতরটা রক্তাক্ত করে ফেলবে, তাকে শান্ত করতে গিয়ে চোখে জল এসে পড়বে, তবু আমরা এখানেই, এই শহরের মাটি কামড়ে পড়ে থাকব।

আপনি অন্যবারেব মত এবাবও নতুন টাইম-টেবল আনিয়ে নিয়েছিলেন, দেখছিলেন। আমরা ত কোথাও যাব না, তবু আপনাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলুম, ঝুঁকে পড়ে দেখছিলুম। আপনি বললেন, নাঃ, এবারে আর দূরে যাওয়া হল না, সেই পুবনো গিরিডিতেই ফের যেতে হবে দেখছি। হাতে বেশি টাকা নেই। আমরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে এলুম। গিরিডিই বা আমবা যেতে পারছি কই।

তবু পরদিন সুব্রত যখন চুপেচুপে আমাদেব জানাল, আমবাও যেতে পারি, আমরা সকলে আহ্লাদে হাত তুলেছিলুম। সকলে, মানে আমরা তিন জন, সুব্রত, ভবানী আব আমি, যাবা আপনার বাসার পাশের মেসবাড়িটার একতলার চাব নম্বব ঘরে সারা বছর পড়ে থাকি। আমাদের সঙ্গেই আপনার বেশী ভাব কি না।

আমরা সুব্রতকে জিজ্ঞাসা করলুম, কী করে সুব্রত, কী করে আমরা যাব?

সুব্রত তখন বুঝিয়ে বলল। সে এবার কোথা থেকে বাড়তি কিছু টাকা পেয়েছে, সেটাই আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে।

না, একেবারে দান নয়, ধার। আপাতত, খরচটা সুব্রতই চালিয়ে নেবে আমরাও না-হয় সামান্য কিছু কিছু দেব, পরে ধীরে ধীরে সুব্রতকে শোধ করে দেব।

আমরা যেন হাতে স্বর্গ পেলুম। এ-ও অপচয়, একটুখানি অন্যায় বিলাস, কিন্তু মোটে একবারই, এই প্রথমবারই তো? এতে কোন দোষ নেই। খরচ কতই বা। হিসেব করে দেখলুম, বুঝে চললে মাথাপিছু পঞ্চাশ-ষাটের বেশি পড়বার কথা নয়।

ব্রজনাথবাবু, আপনাকে গিয়ে আমরা যখন বললুম, আমরাও গিরিডি যাব, চলুন না, একসঙ্গেই যাই, আপনি অবাক হয়ে চেয়েছিলেন। পরে আপনার মুখে খুশির কয়েকটি রেখা ফুটে উঠতে দেখেছি। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে আপনি আস্তে আস্তে বলেছেন, 'বেশ।' তখনও বুঝিনি, আপনার হাসিটা মেকি।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, ব্রজনাথবাবু, আমাদের প্ল্যানটা সঙ্গে সঙ্গে পাকা হয়ে গেল। কবে যাব, কোন্ গাড়িতে, স্টেশনের কোথায় আমরা এ ওর জন্যে অপেক্ষা করব—সব তখনই ঠিক করে ফেললুম। এমনকি, গিরিডির কোথায় বাসা নেব, তা-ও। বাতাসে ছুটি আর শরতের ছোঁয়া লেগেছিল, আমরা সামনের ক'টি দিনের দিকে চেয়ে প্রত্যাশায় অধীর হয়ে উঠেছিলাম।

কিন্তু ব্রজনাথবাবু, আপনি ত আসেননি। সেদিন আমরা আপনার জন্যে বুকিং অফিসের সামনে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। প্রতিটি যাত্রীর মুখে আপনার মুখ খুঁজেছি। কতবার সিগন্যালের লাল আলো পালা করে হলদে আর সবুজ হয়ে ফের লাল হল। আপনি এলেন না। আমরা ফিরে এলাম।

আপনাকে কিন্তু বাসাতেও পেলাম না। চাকর বলল, আপনি গিরিডিতে। শুনে আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাউয়ি করলুম। আমাদেরই একজন বলল, 'কই, তিনি ত—'

আমি চোখের ইশারায় তাকে থামতে বললুম। ফিরে আসতে আসতে সুব্রত বলল, 'তবে কি তিনি অন্য কোন গাড়িতে—'

না, এমন ভুল ত হবার কথা নয়। দিন এবং গাড়ির সময় আপনার নোট-বইয়ে যে টোকা ছিল। আর আমাদের ফেলে আপনি যাবেনই বা কেন।

কিন্তু ব্রজনাথবাবু, আপনি বাসায় ত আর ফিরলেন না? সেদিন না, তার পর দিন না। আজ অবধি না। আজ সকালে আপনার একটা চিঠি পেলাম। হাতের লেখা আপনার, ওপরে লেখা রাজগীর। তারিখ গতকালের। কিন্তু ব্রজনাথবাবু, চিঠিটা ত গিরিডি থেকে লেখা নয়। আপনি চিঠিতে ক্ষমা চেয়ে একটা কৈফিয়ত দিয়েছেন, হঠাৎ কেন আপনাকে পরেশনাথ পাহাড়ে অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে যেতে হল। সেখান থেকে সোজা গিয়েছেন তাকে নিয়ে রাজগীর। আমাদের খবরটাও দিয়ে আসতে পারেননি। ক্ষমা চেয়েছেন সেই জন্যে। জানতে চেয়েছেন, আমরা গিরিডি গিয়েছি কি না।

না, ব্রজনাথবাবু, আমাদেরও যাওয়া হয়নি। সুব্রতর যে ক'টা টাকার ওপর ভরসা করে আমাদের এত প্ল্যান, সেই টাকাটার প্রায় সবটাই ওকে হঠাৎ বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হল কি না। ওর বিধবা বোনটির একমাত্র ছেলে টাইফয়েড অসুখে পড়ল। তার ওপর পূজার নানা জামা-কাপড় কিনতে গিয়ে কখন কী করে টাকাটার প্রায় সবটাই খরচ হয়ে গেল, সে নিজেও টের পায়নি।

আমরা বুঝতে পেরেছিলুম, আমাদের যাওয়া হবে না। সেদিন তবু স্টেশনে যে গিয়েছিলুম, সে শুধু যেতে পারলুম না, আপনাকে ওই কথাটা বলতে।

ব্রজনাথবাবু, আপনিও ত যাননি। তবে অমন কাঁচা কাজ করলেন কেন, কেন মিথ্যে চিঠিটা লিখলেন। আমরা যে ডাকঘরের মোহরটাও দেখেছি—চিঠিটা রাজগীর থেকে আসেনি, কলকাতারই কোন জায়গা থেকে আপনি ওটাকে পোস্ট করেছেন। আপনি কেন যে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন, তাও বুঝতে পারছি না।

লজ্জা? লজ্জা কী, ব্রজনাথবাবু, এই পুজোর ছুটিতে বাইরে যেতে ত আমরাও পারিনি। আমরা জানতুম, আমরাই পারি না,

আজ জেনেছি, পারেন না আপনিও। আসলে আমরা, যারা কায়ক্লেশে কোন মতে এই শহরটায় মাথা গুঁজে পড়ে থাকি, আমরা কেউই পারি না। তবু প্রতি বছরই যখন আশ্বিনের শেষে হাওয়ায় শিউলির গন্ধ লাগে, মেঘে আর বকের পাখায় রঙের তফাৎ থাকে না, তখন আমাদের মনের ভেতরে একটা সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। কে যেন কেবলি বলে, 'চল, চল। এই ধোঁয়া আর ধুলোর বাইরে পালিয়ে গিয়ে অন্তত দু'দিনের জন্যে প্রাণভরে নিশ্বাস নিয়ে এস।' শেষ পর্যন্ত কিন্তু কেউই যাই না। টাকার টান পড়ে, প্রয়োজনের চাকার নিচে শখটা গুঁড়িয়ে যায়। আমরা সঙ্গতিহীন নাগরিকেরা, তখন শুধু টাইম টেবিলের পাতা ওলটাই, আপনি মিছামিছি গা-ঢাকা দেন।

সুব্রতরা চটে গেছে ব্রজনাথবাবু। আপনাকে ওরা বলেছে 'জালিয়াত', বলেছে, 'মিথ্যেবাদী'। আমি কিন্তু তা মনে করি না। মিথ্যে কোন্‌টা? আপনার চিঠির শিরোনামার 'রাজগীর' কথাটা অবশ্য মিথ্যে। কিন্তু প্রতি বছরই এই সময়ে আপনার মনে যে বাইরে ছুটিটা কাটিয়ে আসবার সাধ জাগে আমাদের সকলের মনেই জাগে। সেটুকু তো মিথ্যে নয়। সেই সাধটা অত্যন্তই খাঁটি। তার দামই বা কম কী।

ব্রজনাথবাবু, আপনার লজ্জা পাবার তাই কোন হেতু নেই। কিংবা আপনার লজ্জা আমাদের সকলেরই। আজ বিজয়া। আজ আপনি কেন দূরে থাকবেন। আপনাকে অকপটে ডাকছি, আপনি ফিরে আসুন।

নীরদ ভয় পায়নি। কমলার হিম চোখের স্থির মণি দু'টির দিকে চেয়ে থাকতে না। সিঁদুর-লেপা ভীষণ সুন্দর আর ঠাণ্ডা কপালটা ছুঁতেও না। পায়ের দিকে চোখ নামিয়েছে : আঙুলগুলো কঠিন, একটু-বা বাঁকান, আলতায় ছোপান। বুক তবু কাঁপেনি। রাশি রাশি তাজা ফুল মরা শরীরটায় নিজেই ছড়িয়ে দিয়েছে।

পথে নেমেই ওরা কর্কশ গলায় হরিধ্বনি তুলেছিল। নীরদ চমকে উঠেছে, কিন্তু ভয়ে নয়। ওরা বরং চুপ করে থাকলে ভাল হত। এক পশলা বৃষ্টিতে ভেজা পিচের রাস্তায় ওদের খালি পায়ের ছপছপ শব্দ শোনা যেত।

শ্মশানেও ওরা বড় বেশী হল্লা করছিল। কোথা থেকে টেনে টেনে এনে ছুঁড়ে ফেলেছিল কাঠ, ঘিয়ের ভাঁড় উপুড় করে ঢালছিল। বিড়ি ধরিয়ে খুকখুক করে কাশছিল কয়েকজন, একজন বিশ্রী একটা গান ধরেছিল। শীতার্ত একটা কুকুর ফিরে ফিরে এসে চিতাটিকে প্রদক্ষিণ করে শরীরটা সেঁকে নিল, নাক উঁচু করে উৎকণ্ট গন্ধ শুঁকল হাওয়ার, তারপর মট করে একটা হাড় ফাটতেই কেঁউ করে পিছিয়ে গেল। শোকার্ত অশথ্থগাছটির পাতা চুঁইয়ে তখনও জল ঝরছে।

একজন বলল, 'কী ঠাণ্ডা মাইরি, আর খানিকটা থাকতে হলে বুকে সর্দি বসবে, ওখানেই শুতে হবে।'

ইশারায় সে চিতাটা দেখিয়ে দিল।

আর একজন ভরসা দিয়ে বললে, 'না, বেশীক্ষণ লাগবে না।' বলেই উপরের দিকে তাকাল। 'আর বৃষ্টি যদি না হয়, তবে বড় জোর আধ ঘণ্টা।'

'বউটা কী হালকা আর রোগা। ভাল করে খেতে পেত না নাকি?' বলেই তৃতীয় একজন আড়চোখে নীরদের দিকে চেয়েছে।

নীরদ একটু দূরে বসে ছিল। ঘাটের সিঁড়িগুলো ধাপে ধাপে নেমে যেখানে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে, তার কাছাকাছি। দশ-বারো বছরের একটা ছেলে তখন থেকে চোখের জল মুছছে। বোধ হয় মা মারা গিয়েছে। ওকে নিয়ে এসেছে মুখে আগুন দিতে হবে বলে। যেটুকু করবার, করা হয়ে গিয়েছে, ছুটি পেয়ে এখন ছেলেটি কাঁদছে। শুধুই কাঁদছে না, মাঝে মাঝে চোখ খুলে ভাটির দিকে ভেসে-যাওয়া কচুরির গাঢ় সবুজ পাতা আর বেগুনী ফুল অবাক হয়ে দেখছে। হয়ত ঘাটের সিঁড়ি গুণছে। কিন্তু যে কটা ডুবে আছে, তার আর হিসাব পাবে না। যে কচুরিপানাগুলো ভেসে গেল, জোয়ারের টানে তার কিছু কিছু হয়ত এই ঘাটেই ফিরে আসবে, কিন্তু তার মা আর ফিরবে না। কিন্তু এসব কথা কি ছেলেটি ভাবছে? ওই বয়সের ছেলের কি কিছু ভাবে, ভাবতে পারে?

আসলে, গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নীরদ টের পেল, তার নিজের ভাবনাই সে ছেলেটির উপর আরোপ করেছে। কমলা আর ফিরবে না। কাল রাতে ছিল, ভালবেসেছিল, আজ সকালে ছিল, ঝগড়া করেছিল। এক সঙ্গে খেতেও বসেছিল দু'জনে।

হঠাৎ জল খেতে গিয়ে কমলা বিষম খেল, নীরদ ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'সব কাজে তোমার তাড়াতাড়ি।'

হাত থেকে খসে গ্লাসটা তখন মেঝেয় খান খান হয়ে পড়েছে। সেই কাচের টুকরো আর জলের মধ্যই শুয়ে পড়েছে কমলা, ছটফট করছে।

তাড়াতাড়ি পাখাটা জোরে চালিয়ে দিল নীরদ, জানালা-দরজা খুলে বাইরের রোদ আর হাওয়ার কাছে সাহায্য চাইল।

'বড় কষ্ট।'

কমলার মাথাটা নীরদ তুলে নিল কোলে, ওর জামা-কাপড় ঢিলে করে দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ওরই ফাঁকে একবার উঠে নীচের দোকান থেকে ফোন করে ডাক্তারকে খবর দিতে পেরেছিল।

ডাক্তার ঘরময় ছড়ান জল আর কাচের টুকরোগুলোর দিকে তাকালেন, চশমার আড়ালে সন্দিগ্ধ ভ্রূ কুঞ্চিত হল, বিরক্ত ঠোঁট উল্টে নাড়ি দেখলেন, মাথা নাড়লেন আস্তে আস্তে।

কমলার চোখের অপলক মণি ততক্ষণে স্থির হয়ে এসেছে।

নীরদ তখনও ভয় পায়নি।

অশ্বত্থগাছের পাতা থেকে টুপটাপ করে জল ঝরছে, কনকনে হাওয়া চিতার আগুনটাকে ঝুঁটি ধরে নাড়ছে, আর জ্বালা জুড়তে নিস্তব্ধ নীল একটি নদীর জলে ঘাটের কয়েকটি সিঁড়ি ডুব দিয়েছে—একটু ছমছমে ভাব, কিন্তু একে ভয় বলে না।

পিঠে কে হাত রেখেছে! নীরদ চমকে ফিরে চাইল। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক। উদ্যোগী হয়ে তিনিই সব ব্যবস্থা করেছেন, ডেকে এনেছেন শ্মশানবন্ধুদের।

'ফুরিয়ে গেছে। জল ঢেলে দেবেন আসুন।'

সম্মোহিত নীরদ ভদ্রলোককে অনুসরণ করেছে।

সব ধোঁয়া নিবে গিয়েছে, সব ছাই ধুয়ে গিয়েছে।

নীরদ চলে আসবে, সেই ভদ্রলোকই ওর হাত ধরে টেনেছেন।

'ওদের কিছু দিন। পরিশ্রম হয়েছে, ওরা চা খাবে।'

নীরদ বাক্যব্যয় না করে একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়েছে।

'আমি এবার যাই।'

'কোথায় যাবেন?'

'বাসা—বাসাতেই যাব।'

'একটু দাঁড়ান। আমিও আসছি।'

নীরদ অন্য সময় হলে হেসে উঠত। ভদ্রলোক ওকে একা ছাড়তে ভরসা পাচ্ছেন না। যথাসাধ্য নম্র গলায় নীরদ বলল, 'না, আমি একাই যাব।'

ওর স্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভঙ্গি দেখে ভদ্রলোক হয়ত একটু ভয় পেলেন। বললেন, 'আচ্ছা আসুন।'

তখন পায়নি, কিন্তু নীরদ পেয়েছে পরে, বাসায় ফিরে এসে।

প্রথমে অভ্যাসবশে বিজলী ঘুন্টির বোতাম টিপেছিল। দরজা খুলল না, হালকা চটিপরা, পায়ের পরিচিত শব্দ শোনা গেল না, নীরদ ভয় পেল। সে ভয়টা মাছির মত উড়ে এল, একটু অস্বস্তি হল, কিন্তু তাকে তাড়াতেও সময় লাগল না। কমলা নেই, দরজা খুলবে কে! ভয় গেল, তবু ফোকর খুঁজে চাবি পরাতে গিয়ে নীরদকে গলদ্‌ঘর্ম হতে হল। ঝিমবে বলে আয়েসী একটা বিড়াল প্যাসেজের নিরালা কোণটি বেছে নিয়েছিল। আলোয় বিব্রত, পায়ের শব্দে চকিত হয়ে সে ছিটকে তাকটার উপরে গিয়ে বসেছে। শোবার ঘরে পা দিতে না দিতে কয়েকটা প্রগল্‌ভ চড়ুই ফরফর করে জানালার বাইরের আকাশে ফেরারী হয়েছে।

চোখে আলো লাগছিল নীরদ দু' হাতে পর্দা টেনে ঘরে ছায়া বিছিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ভয়ে নয়, শরীরের সব ক-টি পেশী সহসা যেন কঠিন হয়ে গেল।

এতক্ষণ বেশ ছিল ঘরটা; ছড়ান, গড়ান, চওড়া। হঠাৎ ছোট হয়ে গেল। এই রকমই হয়, নীরদ জানে। আলোয় দেয়ালগুলো আলাদা হয়ে সরে সরে থাকে, যেন কেউ কাউকে চেনে না। কিন্তু যেই একটু একটু করে অন্ধকার ঘনায়, দেয়ালগুলো পা টিপে টিপে তখন এগিয়ে আসে। ওদের ষড় আছে, নিশুতি রাতে এক অপরের গা ঘেঁষে দাঁড়াবে। অন্ধকারে আলাদা থাকতে কি ওদেরও ভয়!

আলো নিবলেই তাই নীরদ হাত বাড়িয়ে কমলাকে ছুঁয়ে থাকত। এই ছ'-মাস ধরে। রোজ।

বিছানাটা পাতাই ছিল; নীরদ ইচ্ছে হলে শুয়ে পড়তে পারত। কিন্তু যাকে ছুঁয়ে থাকবে সেই মানুষটা কই! এই বিছানার চাদরটার মতই নীরদের অভ্যস্ত জীবন আর নিয়মকে এলোমেলো করে দিয়ে সে চলে গিয়েছে।

তবু বালিশে মুখ ডুবিয়ে দিতে তারই যেন খানিকটা ফিরে এল। চুলের গন্ধের সঙ্গে থেঁতলান বেলফুলের গন্ধ মাখামাখি হয়ে মিশে

আছে। শুধু ফুল কেন, চুল কেন, ভাবতে ভাল লাগছে না। তবু সত্যি, একটু ঘামের গন্ধও আছে ; এই তিন মিলে কমলা। তার শরীর, তার ব্যক্তিত্ব। তাকে চেনবার চিহ্ন। তিনেরই এক কাজ, একজনকেই মনে করিয়ে দেয়। তাকে ছায়া-ছায়া ঘরে ডেকে আনে।

আনে বটে, কিন্তু ঠিক তাকে নয়, তার মায়াকে। তাকে তখন ছোঁয়া যায় না, কাছে টানা চলে না। সে থাকে দূরে দূরে, সরে সরে, অলৌকিক কণ্ঠস্বরে।

'কষ্ট হচ্ছে না তোমার ?'

'হচ্ছে। খুব।'

কনুইয়ে মুখের আধখানা ঢাকা, নীরদ শুয়ে শুয়ে শুনতে পেল।

'কী করবে তুমি এখন ?'

'ঘুমব।'

'সারা বিকেল' ?

'সারা বিকেল। সারা রাত্রি।'

মিছে কথা। একটা মরা মানুষকে মিছে কথা দিয়ে নীরদ ভোলাবে না। সে ঘুমতেই ত চায়, কিন্তু পারছে কই ? পেয়ালায় যেমন করে চা জুড়য়, এক আকাশ রোদ তেমনই জুড়িয়ে ঠাণ্ডা আর হলদে হয়ে এল, নীরদ তখনও বিছানায় শুয়ে আছে। পিপাসা পেয়েছে মেটাতে পারেনি, কুঁজো আছে, জল নেই, কেননা কমলা নেই। সারা ঘরে ভাঙা কাচের টুকরো ছড়িয়ে সে চলে গিয়েছে।

দেয়ালে অবশ্য এখনও তার ছবি আছে—সে ত কেবলই ছবি। তবু নীরদ তাকেই নালিশ জানাল, 'এই দেখ না, আমি এখনও সেই জামা-কাপড়েই আছি, যা পরে শ্মশানে গিয়েছিলাম। তুমি আমাকে শুকনো কাপড় এগিয়ে দিচ্ছ না। আসল কমলা হলে দিতে।

'আসল কমলা হলে এতক্ষণ স্টোভে কাপ দুই চা-ও গরম হয়ে যেত। বারান্দার টবটাতে এতদিন ফুল ফুটেছে, সেখানে বেতের

চেয়ার টেনে বসতাম তু'জনে। কথা বলতাম। কিই বা বলতাম! হয়ত কিছুই বলতাম না। অন্তত কথা দিয়ে বলতাম না।

আসল কমলা হলে এতক্ষণে ঘাড়ের নীচে, যেখানে ভাঙা খোঁপা-চোয়ান তেল, পাউডার আর ফুল বিচিত্র একটা উত্তেজক গন্ধ সৃষ্টি করেছে, সেখানে মুখ রাখতাম। ঘ্রাণ নিতাম। আমার নাক কাঁপত, ঠোঁট স্ফুরিত হত, কলজে অতি সচল হত, আঙুলের ডগা শক্ত।

'কিন্তু তুমি, ছবির কমলা, তোমাকে নিয়ে আমি কী করব! হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারি, তার বেশী কিছু না। বড় জোর বুকে চেপে ধরতে পারি, কিন্তু সেখানেও কাঠের ফ্রেমের বাধা, কাচের আড়াল। বাসনার পেষণে ঠুনকো কাচটাই চুরচুর হবে।'

'তোমাকে নিয়ে কী করি; কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা হ'ল, কী করি আমার নিজেকে নিয়ে!'

যতক্ষণ বেদনা ছিল কমলার জন্যে, ততক্ষণে নীরদ নিজেকে শক্ত রাখতে পেরেছে। কিন্তু যেই নিজের কথা মনে পড়ল, অমনই চেতনার আকাশ কান্নার কুয়াশায় ছেয়ে এল। কী করি, কী করি! আজ রবিবার। অন্য অন্য রবিবারে আমরা বেড়াতে যেতাম। কমলা হাঁটতে চাইত। জুতোর স্ট্র্যাপ যতক্ষণ না এই-ছেঁড়ে এই-ছেঁড়ে হত, ততক্ষণ হাঁটতেই থাকত। শো-কেসে সাজান বেসাতি চোখ দিয়ে চাকত। যেদিন বেড়ান ছিল না, সেদিন গান-শোনা ছিল, কিংবা ছবি দেখা, কিংবা কিছু না, শুধু বসে থাকা। আমার সব ক-টি বিকেলের স্বত্ব ওকে বিনা শর্তে দান করেছিলাম। সেই বিকেল আমার হাতে অফুরন্ত অনন্তকাল হয়ে জমে রইল, একে নিয়ে কী করি!

যখের-ধন-পাওয়া দিশাহারা মানুষের মত নীরদ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। একটা সিগারেট ধরিয়েছিল, নির্নিমেষ চোখে চেয়ে রইল তার ধোঁয়ার দিকে। যেন ওর সব প্রশ্নের জবাব ওই ধোঁয়ার রেখায় রেখায় লেখা হয়ে যাচ্ছে।

সিগারেটের ধোঁয়ায় কখনও মুখের ছায়া পড়ে না, কিন্তু মনটাকে স্পষ্ট পড়া যায়, কিন্তু একথা নীরদ এর আগে ত কোনদিন ভেবে দেখেনি।

আবার দরজায় তালা দিল নীরদ, রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

বেলা বলল, 'আরে, নীরদবাবু যে! আসুন, আসুন। তারপর, পথ ভুলে নাকি?'

পর পর কয়েকটা সিগারেট টেনে আর খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিয়ে নীরদের স্নায়ু শক্ত হয়েছিল। হেসে বলল, 'ভুলে নয়, চিনে।'

এসব জায়গায় জুতসই জবাব দেওয়াই রীতি।

বেলা ভ্রূভঙ্গি করল, মুচকে হাসল একটু, শেষে বলল, 'আপনি বসুন, এখুনি আসছি।'

বলেই ওঘরে গেল, যেতে যেতে দু' ঘরের মাঝের পরদাটা টেনে দরজা-জোড়া করে দিতে ভুলল না। পরদাটা টানবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে একটু হাসল।

সে-হাসির যা-খুশি-তাই মানে করা যায়। কোন মানে নাও থাকতে পারে।

অবশ্য মানে নিয়ে ব্যস্ত হবার দরকার নীরদ বোধ করেনি। কেননা মাথার উপরে পাখাটা অনলস এবং বিশ্বস্ত, ঘুরছিল। চেয়ারটা হেলান অতএব আমামপ্রদ, আর হাতের কাছেই সচিত্র একটা সিনেমা-কাগজ আধ-খোলা। ব্যস্ত হাওয়া, যার পড়বার ফুরসুত নেই একটার পর একটা পাতা উল্টে যাচ্ছিল। হয়ত একটু আগে পত্রিকাটা ছিল. তন্দ্রাতুর বেলার হাতে। সেও সম্ভবত এক বর্ণ পড়েনি, শুধু ছবি দেখেছে। হাওয়া পড়ে না, পড়তে জানে না। মেয়েরা জানে তবু পড়ে না। ছবি দেখে। থাকলে।

যে-হাওয়া নিরক্ষর এবং অন্ধ, শুধু পাতা ওল্টায়, তার আবর্তে সিগারেট ধরান দুঃসাধ্য। কিন্তু নীরদ অভ্যস্ত, কোন অসুবিধা হ'ল না। দীর্ঘ একটা টান দিয়ে সে চাইল পরদাটার দিকে। হাওয়া ত চপল আর উৎসুকও—সে কি পরদাও মাঝে মাঝে সরায় না? একবারও কি তার সাধ হয় না, ও-ঘরে উঁকি দিতে? যে-ঘরে বেলা গিয়েছে?

বেলা এ-ঘরে নেই। এখন নেই। নীরদ আছে। বসে আছে। একটু আগে বেলা এখানেই ছিল, নীরদ ছিল না। নীরদ এল, বেলা রইল না। ও-ঘরে গেল।

আসলে, ক্ষয়ে-আসা সিগারেটটার দীপ্ত ডগা ইতিমধ্যেই নীরদকে বুঝিয়ে দিয়েছিল বেলা এখন ও-ঘরেও নেই। কলঘরে গিয়েছে। মুখ-টুখ ভাল করে ধোবে, ঢুলুঢুলু চোখে জল ছিটিয়ে, ফোলা-ফোলা গাল প্রথমে সাবানে পরে শুকনো তোয়ালের, আরও পরে স্নো-পাউডারে ঘষে ঘষে ঘুমের সব আদরের ছাপ মুছে ফেলবে।

মেয়েদের এসব সঙ্কোচের কোন মানে কি আছে! যেন ঘুম দ্বিতীয় একটা পুরুষ, যাকে নিয়ে বেলা এতক্ষণ ভর-দুপুরে দরজা-ভেজান ঘরে ছিল; যার চিহ্ন মুখে-চোখে মেখে নীরদের সামনে এসে দাঁড়াতে বেলার এখন লজ্জার অবধি নেই। যতক্ষণ এ-ঘরে ছিল, ততক্ষণ তাই মুখের আধখানা আঁচলে ঢেকে রেখেছিল।

বেলার কাছে যে ঘুম পুরুষ, নীরদের কাছে সেই আবার মেয়ের বেশে দেখা দিতে পারে, 'চোখ বোজ ত', বলেই মনের সব ভাবনার আলো নিবিয়ে দিয়ে, বুকের ভিতরে মুখ লুকিয়ে. মিশে গিয়ে, সত্তাকে অবশ করে দিতে পারে। ততক্ষণ বেলা কলঘরে জল ঢালুক, কিংবা পা টিপে টিপে পাশের ঘরে ফিরে জামা বদলাক, পাটভাঙা শাড়ির চকচকে খোলসে নতুন হোক। তখন কৌতূহলী হাওয়া পরদা সরিয়ে ও-ঘরে যত খুশি উঁকি দিক না, ক্ষতি নেই।

'ঘুমিয়ে পড়লেন ?'

চকিত নীরদ চোখ মেলল। বেলা স্নান সেরে এসেছে। কনুই রেখেছে ওর চেয়ারের হাতলে, ছোট্ট মোড়াটা টেনে মুখোমুখি বসেছে। মুখ টিপে হাসছিল কিনা নীরদ বুঝতে পারল না। চোখ রগড়ে সোজা হয়ে বসল, তবু জড়তা গেল না, তখন হাই তুলল।

'ঘুমইনি ত। চোখ বুজে ছিলাম।' এইটুকুই যথেষ্ট হত, তবু নীরদ যোগ করল, 'ভাবছিলাম।'

'আজকাল আর দেখতে পাই না যে! ডুমুরের ফুলটি হয়েছেন।'

'না ত।' নীরদ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তবে হ্যাঁ, এই, কাজ থাকে।'

'বুঝেছি।' বেলা বলল, 'বউ বকে? নীরদবাবু, তুমি ত বিয়ে করেছিলে, না? তা বউ কোথায়?'

নীরদ ফস করে বলল, 'নেই।'

'নেই?'

একবার ঢোঁক গিলল নীরদ, বলল, 'মানে, এখানে নেই।'

'বাপের বাড়ি বুঝি?'

নীরদ ঘাড় কাত করল।

'হঠাৎ বুঝি?'

নীরদ বিরক্ত হয়ে উঠছিল, ঘামছিল। এই জেরার যেন শেষ নেই! ঘরে ছায়া নেমে এসেছে, বিকালের রোদের গায়ে পাকা পেয়ারার রঙ ধরেছে, নীরদের মনে হ'ল সেটা থকথকে বুড়োটে— নরম, বিস্বাদ। নীরদ নিজেও যেন অক্ষম হয়ে পড়েছে, ফোকলা মাড়িতে পেয়ারাটাকে চেপে ধরতে চাইছে, পারছে না, লালায় মাখামাখি হয়ে পেয়ারাটা কেবলই ফসকে ছিটকে পড়ছে।

অস্থির হয়ে নীরদ হাতের সময়-লেখা ঘড়িটাব দিকে চাইল, তারপর বেলার সময়হীন চোখে। বলল, 'চল না, যাই, একটু ঘুরে আসি।'

সে কথা .বেলা শুনতে পেল না, অন্তত ভান করল না শোনবার। কুনুইটা এগিয়ে এনে এবাব রাখল নীরদের হাঁটুতে, আর এক হাতে গাল রেখে বলল, 'বললে না ত নীরদবাবু, বউ হঠাৎ বাপের বাড়ী গেল কেন?'

'না, ঠিক হঠাৎ নয়,' এখন ঘাম নেই, তবু নীরদ রুমাল বার করে কপাল মুছল।—'না, ঠিক হঠাৎ নয়। শরীর খারাপ হ'ল, মানে এই সময়ে প্রথমবারে ওরা সবাই বাপের বাড়ি যায়।'

'ও', বেলা বলল পা দোলাতে দোলাতে। চোখ ছোট করে বলল, 'বুঝেছি।'

তাড়া-খাওয়া চোরের মত ক্রুতত্র্যস্ত হাওয়া হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ল, কাঁপতে থাকল পরদার আড়ালে, লুকল খাটের নীচে, চাদরের ঝালরটা শুধু থেকে থেকে কাঁপতে থাকল।

জানলা বন্ধ করে দিয়ে এল বেলা, এবারে চেয়ারের হাতলে বসল। হয়ত স্বেচ্ছায়, হয়ত ভার সামলাতে একটা হাত রাখল নীরদের কাঁধে। পায়ের বুড়ো আঙুল একবার বাঁকাল, সোজা করল, ফের বাঁকা করল, তারপর শাড়ির পাড়ে সবটাই ঢেকে ফেলল। নীরদ আড়চোখে চেয়ে দেখতে পেল, বেলার চোখে এখনও ছুষ্টুমি। আস্তে আস্তে ওর কাঁধ ধরে, ঝাঁকুনি দিয়ে বলছে, 'বল না নীরদবাবু, এ সময়ে তোমাদের বউয়েরা কী করে! বাপের বাড়ি যায়, আর কী? খুব ঘুমোয় পড়ে পড়ে, না? যাচ্ছে-তাই সব জিনিস খুঁটে খুঁটে খায়?'

'খায়।'

'আর তোমরা, তোমরা তখন আমাদের কাছে আস, কেমন?'

হাততালি দিতে গেল বেলা, ভার সামলাতে পারল না, কেননা শাড়ির পাড় দিয়ে সম্পূর্ণ করে ঢাকা পা ছু'টি তখনও ছিল উঁচুতে, গড়িয়ে পড়ছিল, নীরদ হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল। ধরল, কিন্তু ফেলল না, বরং টানল, টানতেই ছু'হাতের অঞ্জলি একটি নরম মসৃণ মুখের স্পর্শে ভরে গেল।

তারপর, তারও অনেক পর, অন্ধকার নামল। নামল, নাকি বেরিয়ে এল ঘরেরই কোণ থেকে, যেখানে ছু'খানি ইঁটের উপরে তোরঙ্গ আর সুটকেস সাজান; রোজ ভোরে অন্ধকার ভয়ে ভয়ে সরে সরে তোরঙ্গের নীচে লুকিয়ে রোদের থাবা থেকে গা বাঁচায়। আবার সন্ধ্যা হতেই ভীতু কচ্ছপের মত গলা বাড়িয়ে দেয়। আস্তে আস্তে তার সাহস বাড়ে, ক্রমে নিজেকে ছড়ায়, গোটা ঘরখানাই ছেয়ে ফেলে। এই পৃথিবীটাও নিমেষে একটা অতিকায় কচ্ছপ হয়ে যায় নাকি, নীরোদ নরম তলপেটে আলো লুকিয়ে একপিঠ অন্ধকার নিয়ে কাঁপে?

কান পাতলে শোনা যায়, নীরদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই এখন শুধু অনুভূতি আর শ্রুতি হয়ে গিয়েছে। তাই সেও শুনতে পেল, সেই অন্ধকারও এক সময় গুনগুন করে ওঠে। অন্ধকার নয়, বেলা। বেলা গুনগুন করছে।

নীরদ নিজেকে বলতে শুনল, 'একটা গান করবে?' কোলেব শীতলে ডুবিয়ে রাখা মুখ তুলে বেলা বলল, 'এখন, এইভাবে?'

'এইভাবে।'

নীরদ দৃঢ়, গাঢ় গলাতেই বলেছিল, তবু বেলা শুনল না, হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আলো জ্বেলে দিল, ঘরের কোণ থেকে নিয়ে এল একটা বাজনা। নীরদ তখন দু'হাতে চোখ ঢাকল।

খানিক পরে গান থামিয়ে বাজনাটা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, আবার সেই আগের মতই নীবদের খুব কাছে এসে বলল, 'নীরদবাবু, তোমার বউ গান জানে?'

'জানে।'

'গায়? শোনায় তোমাকে?'

'শোনায়।'

'রোজ?'

নীরদ বলল, 'রোজ।'

বেলাকে আবার প্রগল্‌ভতায় পেয়েছে। দু'হাত বাড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধরল নীরদের, আধ-আধ গলায় বলল, 'তোমার বউ রোজ আর কী করে নীরদবাবু?'

'রান্না করে খাওয়ায়।'

'কখন বাড়ি ফিরবে, সেই জন্যে বসে থাকে?'

'থাকে।'

'বিকেল হতে না হতে গা ধোয়, খুব সাজগোজ করে?'

'করে।'

'রোজ?'

'রোজ।'

ওর বুকে তর্জনী দিয়ে টোকা দিতে দিতে বেলা বলল, 'আর কী করে ?'

'আর', নীরদ হঠাৎ প্রবল আবেগে বেলার মুখখানা বুকে চেপে ধরে বলল, 'আর, অনেক, অনেকক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে এইভাবে মিশে থাকে।'

সোজা উঠে এসে দরজার ফোকরে চাবি গলিয়ে দিল নীরদ, আর ভয় করল না। একেবারে শোবার ঘরে ঢুকে আয়নার সমুখে দাঁড়াল। চোখের মণি এখনও কি বিস্ফারিত, নাকের ডগা স্ফীত ? ঠিক বুঝল না। কাচটা যেন ঘষা-ঘষা।

পকেটে হাত দিল, উঠে এল বেল-ফুলের মালা। কখন বেলার খোঁপা থেকে ওর আঙুল মালাটা খুলে নিয়েছে, মনে নেই ত। ফুলগুলো তুলে নাকের কাছে ধরল, জানা-জানা গন্ধ। কার ? বেলার, না, কমলার ? ঠিক চেনা গেল না।

কমলার ছবিটার দিকে চোখ পড়ল তখন। প্রথমে চমকে উঠেছিল, দু'পা পিছিয়েও গিয়েছিল ভয়ে, কিন্তু পর মুহূর্তেই সাহসে ভর করে নীরদ এগিয়ে গেল। মালাটা ঝুলিয়ে দিল ফ্রেমে। জোর করে হাসল। তারপরে খুব কোমল, অবুঝকে লোকে যে সুরে বোঝায়, সেই সুরে বলল, 'জানি, তুমি আমাকে অবিশ্বাসী ভাববে, রাগ করবে। বলবে, একটা দিনও তোমার তর সইল না ? কিন্তু এ রাগের কোন মানে হয় না। বোকা মেয়ে, কিচ্ছু বোঝ না। আমি ত এতক্ষণ তোমার সঙ্গেই কাটালাম।'

কাচের উপরে আঙুল ঘষে আদর করতে করতে নীরদ আবার বলল, 'ওই দেখ, তুমি বিশ্বাস করছ না। বলছ, তোমার সঙ্গে নয়, বেলার সঙ্গে ? বেলা নয়, বেলা নয়, সত্যি বলছি, তুমি, তুমি, তুমি। আর কেউ নয়। রোজ ঘরে ফিরে তোমাকে পাই, আজ পেলাম না। সব ফাঁকা ঠেকল। ঠেকল বলেই ত—'

নীরদ হঠাৎ থেমে গেল। সে বুঝতে পেরেছে। বেলা ত নয়ই, কমলাও নয়। কেউ নয়। অভ্যাস।

তাড়াতাড়ি সরে এল নীরদ, বারান্দায় দাঁড়াল। বৃষ্টি-ভেজা পিচের পথে ওর আসল মনের ছায়া পড়েছে। সেই ছায়া সব জানে। তাই নীরদ তাকেই জিজ্ঞাসা করল : আমরা কি তবে বিশেষ কাউকে নয়, আসলে কয়েকটা অভ্যাসকেই ভালবাসি? হঠাৎ একটা দাঁত পড়লে ফাঁকা লাগে, গালের ভিতরে জিভ ঘুরিয়ে হারান দাঁতটাকে খুঁজি। সিগারেট ফুরিয়েছে জেনেও পকেটে হাত ঢুকিয়ে প্যাকেট হাতড়াই। সবই কি তাই!

নির্ভয়, নির্ভার নীরদ আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

রোজ ওরা চেয়ে চেয়ে দেখে !

যে চোখের পলক পড়ে না, সেই চোখ দিয়েই হাসে। ছ'একজন বিশ্রীভাবে কাশেও। কেউ হালকা সুরে, নিচু পরদায় গান ধরে। আরেক জন মোটা সোটা মহাভারত সাইজের বইটা কোলে টেনে নিয়ে তবলা বাজায়।

ময়না শোনে, ঠুকরে ঠুকরে ছোলা খায়, ছাতু খায়, ঠোঁট দিয়ে খাঁচার শিক ঠোকরায়। কিন্তু কিছু বলে না ! শোনে, মুখ বুঁজে শোনে।

রুনির লজ্জা কেন, ও বোঝে।

লজ্জা হবে না ? রুনির এখন সেই বয়স, যে বয়সে লজ্জাই ভূষণ। রুনির বয়স যদি হত দশ কিংবা বারো, তবে ওদিকের ঘর থেকে কে তাকে দেখছে না দেখছে, তাতে তার বয়েই যেত। যখন শরীর ভরেনি, চাউনি বাঁকা হয়নি, পায়ের গোছ বলে বস্তুই নেই, তখন যে খুশি দেখুক, যত খুশি দেখুক, দেখুক না। আবার, বিয়ে যদি হয়ে যেত রুনির, সে কোলের বাচ্চাকে অনায়াসে নাচাতে নাচাতে বারন্দায় এসে দাঁড়াতে পারত। ঘরে ঢুকে বাইরের দিকে পিছন ফিরে বসে আঁচল আড়াল করে তাকে ছুধ দিত। একবার বাচ্চা হ'লে একটু আধটু অসাবধান হতে দোষ নেই। লোকের নজরে শুচিবাই তখন থাকেই না।

রুনির বউদিরও নেই। নিচের কলতলায় স্নান সেরে সে ভিজে কাপড়ে, বড় জোর বুকের ওপর একটা গামছা আড়াআড়ি ফেলে যত অসঙ্কোচে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে, রুনি তা পারে না।

অভিজ্ঞ ময়না ছাতু খায়। ধোঁকে, আর ভাবে রুনি পারে না। রুনির বয়সী কোন মেয়েই পাবে না। না বাচ্চা, না মাঝ-বয়সী—এই

সময়ে মেয়েরা কিছু জড়োসড়ো হয়। চলতে গেলে পায়ে শাড়ি জড়ায়। যেন আলগা ফুলটির মত, টোকা দিলে ঝরে পড়বে।

রুনিকে ময়না তাই সহানুভূতির চোখে দেখে। রুনি ওর বউদিকে কি বলে, জানে।

বলে, রুনি রোজ বলে।

'বউদি, দাদাকে বলেছ ?'

'হ্যাঁ ভাই বলেছি।'

'কি বললে ?'

'বলল ত যে, বলবে।'

সংক্ষেপে সারা কথা। অন্য কেউ হলে ভাবত, সাঙ্কেতিক ভাষা। অথচ আসলে তেমন কিছু নয় ; ময়না জানে। সেই যে এ বছরের প্রথম ঝড়ে—যখন ইলেকট্রিকের তার-সুদ্ধ, পাখিদের বাসা-সুদ্ধ পিঁপড়ের খাওয়া গাছটা কাত হয়ে পড়ল, খাঁচাটা ভীষণ ভাবে দুলতে দুলতে দড়ি ছিঁড়ে নীচের নর্দমায় গড়াগড়ি খেল, ময়নাটা তবু মরেনি ;—তখনই ত কবাটের কবজা আলগা হয়ে গেল। রুনিদের ঘরের দরজার। মুণ্ড থেকে আধখানা খসা ধড়ের মত কবাট দুটো ঝুলতে থাকল। তখন থেকে ঝুলছে ত ঝুলছেই। ওরা কোন মতে ঠেকনা দিয়ে সামলায় বটে, কিন্তু একটু হাওয়া উঠলেই দরজাটা ফের আলগা হয়ে যায়, ক্লান্ত জীবের মুখের মত হাঁ হয়ে যেন হাঁপায়।

রুনির ইচ্ছা, দরজাটা মেরামত করা হোক। ওর দাদা বাড়ীওয়ালাকে বলুক।

ও বলে বউদিকে। বউদি যদি বলে অসুবিধে হচ্ছে, তবে দাদার গরজ বেশী হবে। বউদি বলে দাদাকে। দাদা রাজী হয়। বাড়িওয়ালাকে বলবে বইকি, নিশ্চয়ই বলবে। কিন্তু বলে না।

বলে না কারণ, আসলে ভয় পায়। যে মাসে দরজাটা আলগা হয়ে পড়ল, সেই মাস থেকেই ত ওদের বাড়ী ভাড়া বাকী পড়ে আছে, রুনি জানে। দাদার পার্টটাইম কাজটা গেছে। বউদির কথায় দাদা মাথা নেড়ে যতই সায় দিক না কেন, বাড়িওয়ালাকে মুখ ফুটে বলবার

মত সাহস ওর কোন দিনই হবে না। বললেই হয়ত ভাড়ার তাগাদা আনবে। কেঁচো খুঁড়ে সাপ বার করে কাজ কী।

রুনি এসব জানে। ওই ময়নাও জানে। ও ঘুমোয় না যে। ঝিমোয়, আর দেখে। দেখে, দেখে, দেখে।

রুনির ইচ্ছে, এই বারান্দাতেও পুরনো শাড়িটাড়ি যা হয় তাই দিয়ে একটা পরদা ঝুলিয়ে দেওয়া হোক। বউদি তা চায় না। পুরনো কাপড় কই। যদি দু'চারখানা জমেও, তবে কাঁথা তৈরীর কাজে লাগবে। কিংবা বাসনওয়ালাকে দিয়ে নেওয়া যাবে কাপ, ডিশ, গেলাস। পরদা-টরদা ওসব হল বাজে সৌখিনতা, পরদা রোদে জ্বলে, বর্ষায় ভেজে। শেষে পচে খসে ছিঁড়ে পড়ে!

বাইরে পরদা দিলে এই রোদ্দুরটুকুও পাব না যে। এখানে আমার বাচ্চাটাকে শুইয়ে দিই। তেল মাখাই। রোদটুকু গেলে কোথায় যাব? বউদির আপত্তি অনেক।

রোদটুকুর মায়া রুনির কি নেই, আছে, দক্ষিণের খোলা এই বারান্দাটুকু দেখে সেইত প্রথমে খুশীতে নেচে উঠেছিল। কালো সিমেণ্টের ওপর সকালের রোদ যখন এসে পড়ে, মনে হয় প্রকাণ্ড একটা ফুলের তোড়া। তার গন্ধ নেই, রঙ আছে। তাকে শাদা বলব না, সোনালী বলব না, হলদেও না, তিনটেরই কিছু কিছু নিয়ে সে তৈরী। এই তিন রঙই রুনির পছন্দ, আর তিনে মিলে যে রোদ-টুকু তৈরি, তাকে পছন্দ সব চেয়ে।

কিন্তু তবু ত পরদা চাই।

কেননা রাস্তার ওপারেই যে ক্লাবঘর, আর সেখানে যে দিন-রাত আড্ডা চলে, তা তো রুনি আগে জানত না। ওরা তাস পেটে, সিগারেট খায়, গান গায়, নাটকের মহড়া দেয়। বাড়িওয়ালার ছেলেটাই যে ও দলের পাণ্ডা, রুনি তাও জেনেছে। সাহস ত ওরই সব চেয়ে বেশী।

ময়নাকে ছাতু দিতে দিতে রুনি বলে, 'জানিস, সব চেয়ে বাড়াবাড়ি ওই করে। ক্লাবঘরের দরজা খোলা তো থাকেই, আর

যেই টের পায় আমি ঘরে আছি, ওই নির্মলই একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কবিতা পড়ে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। আমাদের বারান্দায় পরদা নেই, কবাটের কবজা নেই, আমি একটু গড়াতে পারি না মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে, স্নান সেরে শাড়ি ছাড়তে আমাকে কত যে আড়াল আর আনাচ কানাচ খুঁজতে হয়। অভদ্র লোকগুলো সারাক্ষণ ত দেখছেই। ভিখিরির হাতের মত ওদের চোখ খোলাই থাকে। বলতো ময়না যাই কোথা?

ময়না কি পরামর্শ দিয়েছিল কে জানে, রুনি নিজেই একদিন একটা অসমসাহসিক কাজ করে বসল। সে বৃত্তান্তটা নিজেই ময়নাকে শোনালো।

তখনও বুক ধড়ফড় করছে, বলল, 'জানিস, আজ আমি নিজেই ওখানে গেছলুম। বলতো, কোনখানে?'

রুনি খানিক চুপ করে রইল, যেন ময়না কী বলবে, তার অপেক্ষা করছে। কিন্তু ময়না যখন বলল না, বা বলতে পারলো না, তখন রুনিকে বলতে হল। —'গেছলুম ওখানে। রাস্তা পেরিয়ে, ওই ক্লাবঘরে। ক্লাবঘরে ঠিক নয়, ক্লাবঘরের বারান্দায়। ভাবতে পারিস? তুই বুঝি বিশ্বাসই করছিস না? বেশ, তোকে খাঁচা থেকে বার করে নিই, আমার বুকে চেপে ধরি, তা হলে তুই টের পাবি, এখনও আমার বুকটা কী ভীষণ তাড়াতাড়ি ওঠাপড়া করছে। করবে না? সোজা কাণ্ড করেছি নাকি। গিয়ে দাঁড়ালুম ক্লাবঘরের বারান্দায়। ওরা ছিল, সকলেই ছিল। আমার পা কাঁপছিল, ভাবলুম ঝোঁকের মাথায় এতটা করে ভাল করিনি। ফিরে যাই। কিন্তু ফেরবারও উপায় ছিল না। কারণ, ও আমাকে দেখে ফেলেছে। বাড়িওয়ালার ছেলে নির্মল। দলের ওই সর্দার কিনা। চেহারাটা ভাল হলে কী হয়, ভারী অসভ্য আর পাজী। ময়না, তোকে আর কি বলব, তুই ত সবই জানিস। ও শিস দেয়, যখন তখন হাসে, রাগে আমার গা রী-রী করা উচিত। উচিত, কিন্তু করে না। সত্যি কথা বলতে কি, আর শুধু তোকেই চুপিচুপি বলছি, আমার একটু মজাই লাগে।'

ময়না অবাক হ'ল। খাঁচার শিক ঠুকরে ঠুকরে ওর বিস্ময় প্রকাশ করল।

রুনি বলে গেল, 'যাক, যা বলতে এসেছিলাম, তোকে সে-কথা বলি। ওরা আমাকে আজ খুব অপমান করেছে রে। অপমানই ত। আমি বললুম ওকে, নির্মলকে, আপনারা এই ঘরের দরজাটা বন্ধ করে রাখতে পারেন না ?

'একটু জোর দিয়ে, গলায় একটু রাগ ফুটিয়ে বলেছিলাম। আমি বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। নির্মলই বারান্দায় এল। অন্য যে-কোন একজন আসতে পারত। কিংবা ওরা সবাই মিলে। কিন্তু এল নির্মলই। উনিই নাটের গুরু কিনা। ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখলেন। আহা যা না ছিরি, ভুরু কোঁচকালে ওকে কতই না ভাল দেখায়! নির্মল বলল, আমরা দরজা বন্ধ করে রাখব কেন ? বললুম, আমরা ও-পাশেই থাকি, চলাফেরা করি, অসুবিধে হয়। তবু ও বলল, কী অসুবিধে ?

'কিছু যেন বোঝেন না। বুঝলি ময়না, যেন ন্যাকা। মেয়েদের কত রকমের অসুবিধে আছে, সব মুখ ফুটে বলা যায় নাকি ? এক ঘর পুরুষ এই সরু গলিটার ওপাশেই হাঁ করে চেয়ে আছে জানলে কোন মেয়ে নিশ্চিন্ত মনে শুতে পারে ? দরজাটার পাল্লা আলগা, তুই জানিসই তো।

'বললাম, ওকে সব বুঝিয়ে বললাম। ভদ্রলোকের ছেলে ভেবে-ছিলাম, সব শুনে ওর সহানুভূতি হবে। দূর, দুর। ও মানুষ নাকি ? করল কি, পিছন ফিরে ওর ইয়ারদের দিকে চেয়ে বলল, শুনেছিস, ওনাদের অসুবিধে হবে বলে আমরা নাকি ক্লাবঘরে বসতে পাব না।

'আমি বললাম, বসতে পাবেন না, তা বলিনি। শুধু দরজাটা বন্ধ করে রাখতে বলেছি। জানিস ময়না, একথা শুনে ও বিশ্রীভাবে হেসে উঠেছিল। একটা হো হো আওয়াজকে যেন ডেলা পাকিয়ে আমার মুখে ছুঁড়ে মেরেছে। আমার লেগেছে। মুখ লাল হয়েছে, কেঁদে ফেলিনি কিন্তু চোখ ফুলে উঠেছে।

'ভিতর থেকে ওর বন্ধুদের মধ্যে কে বলে উঠেছে, ওকে স্পষ্ট কথা বলে দে নির্মল, ওসব আবদার এখানে চলবে না।

'নির্মল সত্যিই আমাকে সেই কথাই বলল। বরং একটু বাড়িয়েই বলল। অত সুবিধে অসুবিধে বাছতে গেলে তোমার দাদাকে একটা নির্জন পাড়ায় নতুন একটা বাড়ি তৈরি করে উঠে যেতে বল। সেখানে কারুর নজর পড়বে না। ঠাট্টা ছাড়া কী। আর কী ছোটলোকের মত ঠাট্টা! যাদের বাড়ি ভাড়া বাকী পড়ে, তাদের বাড়ি তৈরি করে চলে যেতে বলা মানে অন্ধকে অন্ধ, খোঁড়াকে খোঁড়া বলে গাল দেওয়া। না, ময়না? আর শুনলি তো, ও কিনা আমাকে তুমি বলল! আলাপ ছিল না, পরিচয়ও না, হলামই বা ওদের ভাড়াটের মেয়ে, তাই বলে প্রথম সাক্ষাতেই একেবারে তুমি! ও ভদ্রতা শেখেনি। তবু দমিনি, মরীয়ার মত বলেছি, বেশ, তবে আমাদের বাসাটা মেরামত করে দিন। দরজাটায় কবজা লাগান। একটা চোখ ছোট ছোট করে ও তখন আমার দিকে চেয়েছে। '—ওসব কথা আমার বাবা জানেন, তাকে বল।'

'ময়না, তখন আমি চলে এসেছি। আসতে আসতে শুনেছি, ওরা সবাই মিলে হাসছে। একজন বলল, আমার গলা নকল করে বলল, আমাদের অসুবিধে হবে, অতএব আপনারা দরজা বন্ধ করে সেদ্ধ হয়ে মরুন! মরে যাই। আরেকজন বলল, খবর্দার নির্মল, ওর কথায় কান দিবিনে, ওদের ঘরের দরজাও সারিয়ে দিবিনে। বাবাঃ, দিব্যি এখানে বসে বসে সকলে মিলে নানান মজার চীজ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের নজরে ওদের গায়ে যদি ফোসকা পড়ে, তবে ওরা উঠে যাক। নির্মলকে চাপা গলায় বলতে শুনলুম, উঠবে কী করে, ঘর ভাড়া তা-হলে কড়ায় ক্রান্তিতে মিটিয়ে যেতে হবে না? ময়না, আমি রাস্তা পার হয়ে এসেছি, আমার বুক এখনও কাঁপছে, আমার হার হয়েছে।'

ময়না টের পেয়েছিল, কিন্তু সবটা বুঝে উঠতে পারেনি। সেই যে সেদিন রুনি অতক্ষণ ধরে কাঁদুনি গেয়ে গেল, নালিশ করল

বাড়িওয়ালার ছেলেটার নামে, তারই নাম ত নির্মল? ফর্সা, লম্বা, চালিয়াত ছেলেটা? সে যে আজকাল ঘন ঘন যাওয়া আসা শুরু করেছে—সেদিনের পর থেকেই। ময়না তাতে অবশ্য অবাক হয়নি। এসব ছেলের ধরনধারণ সে জানে। যারা ক্লাব ঘরে আড্ডার ছুতোয় সামনের বাড়ির মেয়েদের ওপর নজর রাখে, তারা একটু আলাপের সুযোগ পেলে আর রক্ষা নেই।

ময়না অবাক হয়েছে রুনির ভাবগতিক দেখে। ছোকরা, ওই নির্মল, বারবার সে নানা ছুতোয় আসছে, তাতেও তো রাগ করছেই না, বরং প্রশ্রয় দিচ্ছে। ছি, রুনি, তুমি এমন বেহায়া! ওই ছেলেটাই তোমাকে সেদিন কী অপমান করেছিল, এরই মধ্যে ভুলে গেলে? হলই বা ও বাড়িওয়ালার ছেলে, ওদের অনেক পয়সা, না হয় স্বীকার করলুম ছেলেটা দেখতেও ভাল। কিন্তু তুমি ত জান, ও আসলে রাঙামুলো, ওর হাসি দেখে ভুলে যাওয়া তোমার উচিত হয় নি।

কিন্তু খাঁচায় বন্দী ময়না শুধু দেখতেই পারে, রাগ করতেও পারে, বড় জোর খাঁচাটিকে ঠোকরাবে, কিন্তু প্রতিকার করার সাধ্য তার নেই। সে লক্ষ্য করেছে, ওই নির্মল ছোকরা আসে, যখন ঘরে রুনির বউদি থাকে না তখন। বউদি যখন ছাতে গেছে চুল শুকতে কিংবা কলতলায় কাপড় কাচছে, তখনই ও পা টিপে টিপে আসে। সময়গুলো রুনিই ওকে বলে দিয়েছে কিনা কে জানে! রুনি, তুমি না তেজী মেয়ে, তোমার তেজ কোথায় গেল? নাকি সবই বয়সের রীতি?

ময়নার ঘেন্না ধরে গেল। যে-মেয়ে আধময়লা শাড়ি পরে দিনরাত কাটিয়ে দিত, তার আজকাল সাজগোজের ঘটা কত! চুল আঁচড়ান শেষই হয় না। সম্বলের মধ্যে তো খান তিনেক শাড়ী, তাই কতবার বদলে বদলে পরে, তার ঠিক নেই!

আর কত গল্প নির্মল এলে! ফুসফুস, ফিসফিস, আর কত খিল-খিল হাসি। রুনি, ওই লোকটার ফাঁদে ধরা পড়বার আগে তুমি গলায় কেন দড়ি দিলে না।

সইতে না পেরে ময়নাটা একদিন চেঁচিয়ে উঠল। সবে বুঝি ওরা একজন আরেকজনের হাতে রেখেছিল হাত, হয়ত নির্মলের মুখটা রুনির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, ঠিক তখনই ময়না কর্কশ গলায় ডেকে উঠল। দু'জন ছিটকে সরে গেল দু-দিকে, নির্মল তরতর করে সিঁড়ি টপকে পালাল, আর রুনির বউদি আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে ছুটে এল।

'কী হয়েছে, ঠাকুরঝি, কী হয়েছে?'

'কই বউদি, কিছু না ত।'

ময়না মনে মনে বলল, মিথ্যেবাদী।

রুনির বউদি বলল, 'পাখিটাকে বুঝি খেতে দাওনি? খুব জোরে ডেকে উঠল কিনা, আমি তাই ভয় পেয়েছিলুম।'

'ওকে খেতে দিচ্ছি বউদি, তুমি রান্না ঘরে যাও।'

খেতে দিতে এসে ময়নাকে ভীষণ বকল রুনি।

'তোকে আমি খেতে দেব না ময়না, দেব না, দেব না, দেব না। তুই কেন চেঁচিয়ে উঠলি? বুঝি, হিংসে, তোর সব হিংসে। আমরা দু'জন আগে সখীর মত ছিলুম, দু'জনেই দুঃখী। এখন আমি একা সুখী হতে চলেছি তুই সেটা সইতে পারছিস না, কেমন? না হয় ও আমার হাত ধরেছিলই, না হয় মুখও নুইয়ে দিয়েছিল, কিন্তু ও একটা ইয়ে খেলে কী এমন রসাতলে যেত, শুনি? তুই ভাবছিস, ও লোক খারাপ? তা নয়, ময়না, তা নয়। আমিই আগে ওকে ভুল বুঝেছিলুম। ওর মনটা খুব ভালরে। ওর বাবার, আমাদের বাড়িওয়ালার মত ও চামার নয়। যাক গে, হবু-শ্বশুর, নিন্দে করব না। ও চাকরি খুঁজছে, পেলেই নাকি আমাকে···। বাবা-মার মত ওই করাবে। আমার মত মুখ নাকি ত্রিভুবনে দেখেনি। তুই বিশ্বাস করছিস না?'

রুনি এবার খুব রাগ করল। 'তা তো করবিই না। তোর মনে মনে যে হিংসে! ওই জন্যে ত মাঝে মাঝে তোর ওপর খুব রাগ হয়। ভাবছিস আমি লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়েছি, আত্মসম্মান খুঁইয়েছি। তা

নয় রে, পাখি, তা নয়। আমি আমার 'কোর্ট' ছাড়ি নি। ওই দরজা ওরা সারিয়ে দেবে। সে কথা আজ আদায় করে ছেড়েছি। কী হয়েছিল জানিস? ও যেই ঘরে ঢুকে আমার হাত ধরল, তখুনি আমি আঙুলের ইশারায় ওকে দেখিয়ে দিলুম ক্লাবঘরটা। এ-দরজা হাট, ও-দরজা হাট। ওরই চারজন বন্ধু এদিকে ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে আছে। ব্যাস, বাবুর মুখ অমনই কালো হয়ে গেল। কী বলল, বল ত রে?'

ময়না বলতে পারল না।

রুনি বলে গেল, 'বলল ছিঃ, তোমাদের ঘরটায় পরদার বালাই নেই? আমি বললাম, দরজা ত তোমরাই সারিয়ে দাওনি। ও বলল, হুঁ। আরও বলল, ওর বাবাকে বলে দরজাটা সারিয়ে দেবে, ক্লাবঘরের দরজাও যতক্ষণ পারে বন্ধ রাখবে। বলল, তোমাকে দ্রৌপদী হতে দেব না আমি। কী দুষ্টু বল্ ত। পুরুষেরা ভারী হিংসুটে। আগে একা দেখতেন। এবার বাবু সবটাই নিজের জন্যে রাখতে চান: পরদা না থাকার জ্বালা টের পেয়েছেন। তুই কি বলিস, এক ঢিলে দুই পাখি মারলুম না?'

খাঁচাটায় আস্তে আস্তে একটু দোলা দিল রুনি। ময়নাও দুলতে লাগল। আরও কাছে এসে বলল, 'তুই ভাবছিস সব ওদের ধোঁকা? অমন যদি করিস ময়না, দেব একদিন তোর গলা টিপে। কিংবা খাঁচা খুলে উড়িয়ে দেব। তোর অত সন্দেহ কেন রে? বলছিস, ওর সব কথা মিথ্যে, বড়লোকদের কথায় বিশ্বাস করতে নেই? কিন্তু ময়না, তোকে একটা কথা বলি। তুই ত আমাদের ঘরের হাল জানিস, আমার বয়স কত তাও জানিস, আমাদের উপায়ই বা কি? বিশ্বাস না করেও এতদিন ত জিতিনি, না হয় একবার বিশ্বাস করেই ঠকি?'

অতি-গভীর আর অতি-তুচ্ছ, এই দুই বস্তুকেই আমার লেখা থেকে দূরে রেখেছি। প্রথমটিকে রেখেছি লেখা যায় না বলে। দ্বিতীয়টিকে অযোগ্য বলে।

যা অকিঞ্চিৎকর তাকে স্থায়ী রূপ দেওয়া কঠিন। কোনকালে কোন একটি চরিত্রকে হয়ত বিচিত্র মনে হয়েছিল, একটি ঘটনাকে মনে হয়েছিল, দুর্বোধ্য, মনে সামান্য সময়ের জন্যে অস্বস্তির আলোড়ন তুলে তারা নিজে থেকেই মিলিয়ে গিয়েছে। টুকরো টুকরো কয়েকটা নুড়ি নিয়ে পুরোপুরি কিছু গড়া যায় না।

তবু অনেক লিখে লিখে যখন কলম ক্লান্ত হয়, দেহে অবসাদ আসে, তখন এমন অনেক ছোট ছোট কথা, আর ছবি মনে পড়ে, তাদের নিয়ে আজও কিছু লেখা হয়নি। হয়নি আরও এই কারণে যে, সেই সব ঘটনার সবটা আমিও হয়ত বুঝিনি। শিশু-পত্রিকায ধাঁধাঁ থাকে, তার জবাবও থাকে অন্য পৃষ্ঠায়। পাতা উল্টে সেটি জেনে নিতে হয়। আমাদের গল্পও, অনেক গল্পই, ধাঁধাঁ, তার জবাবও আমরাই দিয়ে থাকি, গল্পেরই শেষাংশে, বোধ হয় শেষ অনুচ্ছেদে। কখনও স্পষ্ট করে, কখনও আভাসে। অর্থাৎ আপনি বিপদজাল গড়ে তুলে আপনি কেটে দিই। কিন্তু যে ধাঁধাঁর জবাব নিজেরই জানা নেই, পাঠকের সামনে তাকে হাজির করি কী করে।

লিখতে লিখতেই মনে পড়ছে, রেখা আর লেখার কথা। বোধ হয় ওরা যমজ বোন। আমি ওদের এক দিনই দেখেছিলাম, সেই হোলির দিনে। দেখেছিলাম, অনেকটা বুঝেওছিলাম, কিন্তু সবটা বুঝি নি।

আমায় রবিদা ওখানে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আগে রবিদার কথা দু'কথায় বলি। আমাদের চেয়ে বয়সে বেশ খানিকটা বড়। আমরা কলেজের ইয়ার, তিনি তখনই জেণ্টলম্যান

হয়েছেন, পড়াশোনা ছেড়েছেন অনেক দিন, ফ্লুট বাজাতেন, আমাদের পাড়ার থিয়েটারে হিরোও হতেন। আমরা যখন শার্টের কলার উলটে দেওয়াই চরম চালিয়াতি বলে জানতুম, তিনি তার অনেক আগে থেকেই গিলে-করা ফিনফিনে পাঞ্জাবি আর চুনোট করা ধুতি পরেন।

তাঁর গায়ে রঙ দিতে গিয়েছিলুম। তিনি নিলেন না। বালতি গোলা জল সবটা উবুড় করে ঢেলে দিলেন।

'বাঃ রে, নষ্ট করে দিলেন?'

'এ-সব কেন এনেছিস?'

'আজ যে হোলি। রঙ দেব না? মজা করব না একটু?'

'মজা?' রবিদা বলে উঠলেন, 'মজার তোরা কী জানিস?'

রবিদা একটা বিশেষ ঢঙে হাসলেন, নাটক করে করে ওটা তাঁর মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আর কিছু না বলে ফ্লুটটি তুলে নিলেন।

আমরাও চলে আসছি, রবিদা পিছন থেকে আমাকে ডাকলেন। কাছে যেতে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন—'আসল মজা দেখতে চাস? তা হলে ঠিক তিনটেয় আসিস। তোকে এক জায়গায় নিয়ে যাব।'

ঠিক তিনটেতেই গেলুম। রবিদা তৈরিই ছিলেন। তাঁর সেই অকলঙ্ক সাজ, আজ অধিকন্তু একটা সাদা চাদর।

রাস্তায় নেমে ট্যাক্সি নিলেন।

কোথায় যাচ্ছি। রবিদা তখন ভাঙলেন না, ট্যাক্সিটাকে সোজা যেতে দিলেন কিছুক্ষণ, তারপর ডাইনে, বাঁয়ে ফেরালেন—শেষের দিকে গাড়ি ডাইনে ঘুরছে না বাঁয়ে, কিছুই খেয়াল করতে পারলাম না, কেননা আমার নিজেরই তখন মাথা ঘুরছিল।

যেখানে আমরা নামলুম, পরে শুনেছি সেটা দর্জিপাড়া। রবিদা তরতর করে একটা বাসার সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন, কড়কড় করে কড়া নাড়লেন। বললেন, 'এটা হল রেখা-লেখাদের বাড়ি।'

'রেখা কে, লেখাই বা কে !'

'কেন, মনে নেই, সেই যে দু'টি মেয়ে আমাদের এখানে নীরবালা আর রূপবালার পার্টে নেমেছিল ? এ্যামেচার আর্টিষ্ট হিসাবে খুব নাম করেছে রে।'

'ওরা তবে আর্টিষ্ট ?'

দরজা খুলে গিয়েছিল এবং ভিতরে পা দিয়েই রবিদা সহর্ষে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—'আরে বিজন যে, কতক্ষণ ? হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো পরিমলবাবুও জুটেছ দেখছি, ব্যাপার কী বল ত, অলি লোভে পরিমল আসিয়া জুটিল ?'

ফরাসে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁদের একজন বলে উঠলেন—'আজ হোলি।'

'ঠিক। আজ প্রাণটা সাবা-বা-বা হযে গেছে।'

ফরাসের এক কোণে আমি কুণ্ঠিত ভাবে বসেছিলুম, রবিদা টেনে এনে একেবারে মধ্যিখানে মহাবাজ করে দিলেন। —'আমার ব্রাদার। খুব লাজুক, কবি-কবি চাউনি দেখছ না। ধরে আনলুম আজ। চুপচাপ বসেছিল, বললুম, চল ব্রাদার, হোলি সেলিব্রেট করবে, চল।'

বিজনবাবু বললেন—'আর অমনি সুড়সুড় করে চলে এল ?'

'এল।' রবিদা চোখ বুজে বললেন।

পরিমলবাবু বললেন—'তোমার ব্রাদারটি অসম সাহসী। দেশ ত এই রকম বীর যুবকদেরই চায়।'

জঙ্গী অভিবাদনের ঢংয়ে ডান হাতটা উপরে তুলে রবিদা বললেন —'টু আওয়ার হোপ, আওয়ার ফিউচার।'

পকেট থেকে গন্ধভরা রুমালে-বাঁধা খানিকটা আবীর বার করে বিজনবাবু আমাকে মাখিয়ে দিলেন। আবীর বেরুল রবিদা আর পরিমলবাবু পকেট থেকেও। মুঠো মুঠো রক্তচূর্ণ ছড়িয়ে পড়ে. হাওয়ার উড়ে, জাজিমটাকে লজ্জা দিল।

আর তখনই ওদের দু'জনকে দেখলাম। রেখা আর লেখাকে। যেমন রোগা তেমনি ফর্সা আর তেমনি লম্বা দুটি মেয়ে। চোখে সুর্মা,

চুলে বেলফুল। পরনে দুটি ফিনফিনে ঢাকাই শাড়ি, কোন বুটিটা শাড়ির, কোনটা শায়ার, ঠিক বোঝবার জো নেই।

ওরা চৌকাটে দাঁড়িয়েছিল। এ ওর গা টেপাটেপি করে হাসছিল।

বিজনবাবু আবীর হাতে ওদের দিকে এগিয়ে এলেন। পরিমলবাবু বলে উঠলেন—'হে মাধবী, দ্বিধা কেন। এই অ-চিরকুমার সভায় এস।'

ও এল না, তখনই এল না, বিজনবাবুকে আবীর-হাতে এগোতে দেখে যেন ভয়ে পিছিয়ে গেল, কিন্তু গেলও না। চৌকাটে পা ঠেকে, হয়ত ইচ্ছা করেই ঠেকে, পড়তে পড়তে সামলে নিল। কিংবা সামলাতেও পারত না, বিজনবাবুই দু'হাতে দু'জনকে ধরে ফেললেন। খানিকটা খিলখিল হাসি তুবড়ির মত জ্বলে জ্বলে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল।

হাসি থামতে দেখি ওরাও ফরাসে এসে বসেছে, পায়ের পাতা অবধি মুড়ে নিয়ে, আঁচল সংযত করে নিয়েছে। কিন্তু সাবানে-শ্যাম্পুতে ফাঁপান চুলের ফুলগুলো এলোমেলো হয়ে গিয়েছে।

আরও খানিক আবীর তুলে ছুঁড়ে দিলেন রবিদা, ওদের চুলের বেলফুল পলকে সন্ধ্যামণি হল।

আমি দেখছিলাম। একটু একটু করে সরে এসেছিলাম দেয়ালের কাছে। জানলার তাকে একটা টেবিল ফ্যান ঘুরছে, তার উঁচু আওয়াজ নেই, যেন অনেক দূরে কোথাও জল পড়ছে, কোথাও পাতা নড়ছে, এক ঝাঁক অন্ধ মৌমাছি বাসা খুঁজে মরছে। জানলায় ছিটের পরদা কাঁপছিল, একরাশ শুকনো অসহায় পাতাকে প্রবল ধুলো-হাওয়া হরণ করে জোর করে উড়িয়ে নিয়ে চলেছিল, জানলা খোলা পেয়ে তারা ঘরে ঢুকে পড়ল।

আমি শুনতে পেলাম, তখন আর যেন কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, ওদের মধ্যেই কে গদগদ গলায় কী-যেন আবৃত্তি করছে। কণ্ঠস্বরের উত্থান পতন সবই নাটকীয়। খানিকটা শুনে বুঝলাম, নাটক-ই। হাতে-লেখা একখানা খাতা খুলে বিজনবাবু সকলকে পড়ে শোনাচ্ছেন।

খানিকটা পড়ে খাতাটা লেখা না রেখা, মোটের ওপর ওদেরই এক জনের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন—'এই জায়গাটুকু তুমি পড়। মেয়ের পার্ট আমার গলায় মানাবে না।'

মুচকি হেসে দুটি মেয়ের একটি মিহি সুরে শুরু করল—'প্রিয়তম, প্রেয়সীরে ত্যাজিয়া বিপিনে—'

আর একটি মেয়ে কখন উঠে গিয়েছিল, যখন ফিরে এল, তখন দেখি, কাঁসার থালায় সাজান চার-পাঁচটা কাচের গ্লাস। রঙ দেখে বুঝলাম সরবত—সিদ্ধির।

তখনও ফিরে ফিরে সেই পৌরাণিক পালা পড়া চলছে। করুণ, মৃদু, ভাবাকুল; কখনও উচ্চ, কর্কশ, গম্ভীর। ওরা মেতে উঠেছে। অর্জুন-সুভদ্রা, না দুষ্মন্ত-শকুন্তলা ঠিক ধরতে পারছিলাম না।

একটা গ্লাস নিয়ে মেয়েটি আমার সামনে এসেও দাঁড়িয়েছে। মুখে অনুরোধ করছে না, হাসছে। আমি ওর মুখের পাউডারের প্রতিটি শ্বেত রেণু, পায়ের রঞ্জিত নখের উপরে শুকনো ঘায়ের দাগ, সব স্পষ্ট দেখতে পেলাম। পেলাম খুব কড়া একটা সুগন্ধ, বোধহয় আতরের।

রবিদা কাছে এসে বললেন—'খেয়ে নে, দেখবি মেজাজ খুলে যাবে, ম্যাজ-মেজে ভাবটাও ছেড়ে যাবে।'

আমার তবু হাত কাঁপছিল। আমি ত এই পরিবেশটাকেই পান করেছি, আবার সিদ্ধি কেন।

তখনও নাটকের মহলা চলছিল। তখনও ঠিক বুঝতে পারছিলুম না সীতা কি পাতালে গেলেন, না শকুন্তলা স্বর্গে। বিজনবাবু খাতাটা বুকের কাছে ধরে আবেগরুদ্ধ গলায় হাহাকার করছেন।

রবিদা আমাকে কানেকানে বললেন—'বোগাস, বিলকুল বোগাস। লোকটা এক লাইন লিখতে জানে না, ড্রামা সম্পর্কে কোন আইডিয়াই নেই ওর, রোল বোঝে না, সিচুয়েশন না, শুধু চ্যাঁচাতে জানে। ভাবে ও একজন মস্ত নাট্যকার। ওই খাতাগুলো নিয়ে থিয়েটারে থিয়েটারে কম ঘোরাঘুরি করেছে? কেউ নেয়নি, কেউ ছুঁয়েও দেখেনি। আর মাল থাকলে ত নেবে? আমরা এ্যামেচার দলেও বার দুই ট্রাই

করেছিলুম—দুঃ, জমলই না। ও-সব পৌরাণিক সীতা-সতী মার্কা মাল এখন কি চলে। যুগটাই বদলে গেছে, জানলি ?'

বিজনবাবু নিজের ভাবে নিজেই বিভোর, শোনাতেই এত ব্যস্ত যে কিছুই শুনতে পাননি। নৈলে হয়ত বিপত্তি ঘটত।

নিজের গ্লাসটা শেষ করলেন রবিদা। ফের নিচু গলায় বললেন—'আজকাল ওর একমাত্র কাজ ছুপুরে আসা, মেয়ে ছু'টোকে ওর নাটক পড়ে পড়ে শোনান। আর কেউ ত শোনে না।'

বললাম—'মেয়ে ছু'টোই বা শোনে কেন ?'

একটু বোধহয় নেশা হয়েছিল রবিদার, তর্জনীতে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে ইঙ্গিতে বোঝালেন, টাকা। তারপরে চোখ বড় বড় করে বললেন—'লোভ।'

কিসের লোভ, ঠিক ধরতে পারলাম না।

খাতা বন্ধ করে বিজনবাবু রেখাকে বললেন—'এটা ডায়না থিয়েটার শীগগিরই নেবে।'

'সত্যি বিজনদা, সত্যি ?'

বিজনবাবু রেখাকে বললেন—'আমি মিছে কথা বলি ? মহলায় পড়ল বলে। তখন কিন্তু রেখা, তোমাকে একটা চান্স আমি পাইয়ে দেব। তুমিই হবে হিরোইন। আচ্ছা, ওই জায়গাটা আবার কর দিকিনি– 'মনে যদি পড়ে নাথ—'

রেখা তোতাপাখির মত বলল—'মনে যদি পড়ে নাথ।'

'আহা, নাথ কথাটা অত চট করে ছেড়ে দিচ্ছ কেন ? একটু টেনে বল। দেখছ না, দীর্ঘস্বর ?'

লেখা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল—'বিজনদা, শুধু দিদিকেই বুঝি চান্স দেবেন ? আমি পাব না ?'

বিজনদার আশ্বাসের হাত দরাজ, মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন—'পাবে, তুমিও পাবে।'

পানের পিক ফেলবেন, এই ছুতোয় রবিদা বাইরে এলেন। আমাকেও ইশারায় ডাকলেন। এবার একটু গলা চড়িয়েই বললেন

—'বোগাস, সব বোগাস। লোকটা মহা চালিয়াত, মিথ্যুক, লায়ার। ওর বই নেবে ডায়না থিয়েটার? কত বড় বড় লেখক সেখানে ধন্না দিয়ে পড়ে আছে, বিজনটা ত খলসে মাছ।' তাতেও জোর হল না ভেবে বললেন—'পুঁটি। বিজনটা পুঁটি।'

'মেয়ে দুটো বিশ্বাস করছে রবিদা?'

'না করে উপায়? আরে, ওদের ডিসকভার করেছিলুম আমি। য়্যামেচার ক্লাবগুলোর সঙ্গে সেই যে ভিড়িয়ে দিয়েছিলুম, তাই ভাঙিয়েই ত এখনও তবু মাঝে মাঝে দু-দশ টাকা আসছে। বিজনটা কী করেছে ওদের জন্যে, কী করতে পেরেছে, এ্যা?'

রবিদা আমাকেই জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন। আসলে টলছিলেন, ওঁর মাথা ঘুরছিল বোধ হয়, একটু নেশা হয়েছিল। বললেন—'নাথিং, এ্যাবসলিউটলি নাথিং। ওদের ভবিষ্যৎ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওদের পাখা গজাবে, সেই পাখা তারপর পুড়বে, ওরা পুড়বে।'

'পুড়বে, ওরা পুড়বে।' রবিদা আরও একটু আবেগ মিশিয়ে আবার বললেন। কথটা জোরে বলতে পারলেন বলেই রবিদার উত্তেজনা কমে গেল। নরম, ভাবাকুল হলেন। খানিকটা আপন মনেই বললেন—'ওদের দোষ নেই, আমি জানি, আমি জানি। য়্যামেচার ক্লাবে নিয়মিত আয় নেই, নিশ্চিত আয় নেই, নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। মেয়ে দুটো তাই এমন কিছু চায় যার ওপর ভরসা রাখা চলে। বাঁধা, পাকা স্টেজে পাকা বাঁধা মাইনের চাকরি চায়। কেউ যদি—' বলতে বলতে চোখ ছোট করে রবিদা আমার দিকে চাইলেন—'ধর, তুই-ই যদি ওদের একজনকে বিয়ে করবি বলে কথা দিস, ওরা তবে তোর দিকেই ঝুকবে। ওরা, মেয়েরা, এ-সব হল্লা চায় না রে, শান্তি চায়। আমি ওদের জানি।'

সিদ্ধি খেলে শুনেছিলুম, কাউকে হাসিতে পায়, কাউকে গানে। কেউ বা কাঁদে। রবিদাকে হয়ত বক্তৃতায় পেয়েছিল; তিনি আবার বললেন,—'আমি জানি। সারারাত না ঘুমিয়ে প্লে করে সকালে বাসায় ফিরে আসে মেয়ে দুটো, তখনও ওই লোকটা একটু ঘুমুতে দেয়

না, সারা ছপুর জ্বালাতন করে। আবার নাটক আনে, শোনায়, পড়ায় মুখ বুজে এরা সে-সব সহ্য করে, কিসের লোভে ? আমি জানি আমি জানি।'

ওই ছুটি মেয়ের প্রতি মমতা, আর বিজনবাবুকে ঈর্ষা রৌদ্র-ছায়ার মত রবিদার মুখে খেলে যাচ্ছিল।

ঘরে ফিরে রবিদা বললেন—'এবার একটা গান হোক।'

সঙ্গে সঙ্গে টের পেলুম, আবহাওয়াটা আবার সজীব হয়ে উঠেছে। পরিমলবাবুও এক কোণে বসেছিলেন, কতকটা বিমর্ষভাবে। তিনি পকেট থেকে আবার এক মুঠো রঙ বার করে ছড়িয়ে দিলেন। রেখা আর লেখা চোখ ঢাকল, ওদের বেণী ছুটো শীতে-নির্জীব সাপের মত পিঠের ওপর নেতিয়ে পড়ল।

রবিদার কথায় সায় দিয়ে পরিমলবাবু বললেন—'হোক, গান হোক।'

বিজনবাবু একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করে বললেন—'ওদের গলা আজ খারাপ যে।'

রবিদা জনান্তিকে আমাকে শোনালেন—'পার্ট করবার সময় গলা ঠিক থাকে।'

লেখার কানে কথাটা গিয়ে থাকবে। বলল— 'সত্যি বলছি রবিদা, গলাটা আজ বসা-বসা। কাল মেঝেয় শুয়েছিলুম, ঠাণ্ডা লেগেছে।'

রবিদা তখন একটা অসমসাহসিক কাজ করলেন। কোন্‌খানটা বসেছে দেখি—বলে ঝুঁকে পড়লেন রেখার দিকে, ওর গলার ছুটি কণ্ঠার ঠিক মাঝের জায়গাটুকুতে আঙুল বুলিয়ে সুড়সুড়ি দিলেন।

রেখা খিলখিল করে হেসে উঠে ছ'হাতে পেট চেপে লুটিয়ে পড়ল লেখার কোলে। লেখা উপুড় হয়ে পড়ল রেখার পিঠে।

হাসি সামলে রেখা বলল—'সত্যি বলছি রবিদা, গান আজ হবে না।'

'হবে না।' মাথা নেড়ে বিজনবাবু বললেন—'আমি বলছি হবে না। আজ শুধু প্লে হবে।'

রবিদার মুখ থমথম করছিল। পকেট থেকে দুটো দশটাকার নোট ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—'যাও ত পরিমলবাবু, নিচের দোকান থেকে কিছু গরম কচুরি, সন্দেশ আর জিলিপি নিয়ে এস। মিষ্টি না হলে কি বাবা নেশা জমে? আর, সামনের দোকানে পাবে চিংড়ির কাটলেট।'

ওই পরদা টানা ঘরে বসেই বুঝতে পারছিলাম, বেলা পড়ে এসেছে। চৈত্রের বিকেল, মাঝে মাঝে হাওয়াটা খেপে উঠছে, শুকনো ধুলোয় মাখামাখি হয়ে ফরাসেই শুতে চাই। শুধু খ্যাপা নয়, মাতালও। একটা মৃদু গন্ধও নিয়ে এসেছে, যেন বকুল ফুলের। কোথায় গাছটা, দেখতে পাচ্ছি না, জানলার বাইরে, তিনটে ছাতের পারে রক্তাক্ত একটা কৃষ্ণচূড়া, কিংবা রক্ত নয়, সেও আবীর মেখে থাকবে। কিন্তু বকুল-গন্ধের উৎসটাও আশে-পাশেই কোথাও নিশ্চয় আছে।

ঠোঙায় মিষ্টি এল, কচুরী এল, প্লেটে কাটলেট। পরিমলবাবু ফেরত নোট ফরাসেই রাখলেন।—'চিংড়ি নেই, ফাউল এনেছি।'

রবিদা চেঞ্জ গুণলেন না, পকেটে পুরে বললেন—'এবার গান হবে, আলবত হবে।'

পলকে যেন চেহারাটাই বদলে গিয়েছে রবিদার, পকেটের ওই নোট আর সামনে-ছড়ান খাবার ওঁকে আত্মপ্রত্যয় এনে দিয়েছে। বিজনবাবুর চোখে চোখ রেখে দৃঢ় গলায় বললেন—'আলবত গান হবে। আমি খাবার আনালুম। আমার হকের গান আমি শুনব।'

বিজনবাবুর মুখের পেশি কঠিন হয়ে উঠেছিল। দু'হাত মুঠিবদ্ধ করে বললেন—'হক আমারও আছে। আজকের এই ফরাস আর টেবিল ফ্যানটা কে ভাড়া করে এনেছে?'

রবিদা যেন একটু থতমত খেয়ে বললেন—'ফরাস ডেকরেটর কালই তুলে নিয়ে যাবে। ফ্যানটা খুলে নেবে। ওরা গরমে পচবে। ঠাণ্ডা মেঝেয় শোবে।'

'আর ওই—ওই কাটলেট, ওগুলোই বুঝি বরাবর থাকবে ভেবেছ?' বিদ্রূপের ভঙ্গিতে করতালি দিয়ে বলে উঠলেন বিজনবাবু— 'ওগুলো হজম হবে না? ওদের আর কোনদিন খিদে পাবে না?'

নিরীহ পরিমলবাবু একপাশে বসে ঘামছিলেন, রুমালে মুছছিলেন মুখ, আর কাটলেট কামড়ে কামড়ে শেষ করে ফরাসেই হাড় ছড়িয়ে ফেলেছিলেন। একটা কচুরী লেখার মুখের কাছে ধরে দেখলুম সাধাসাধি করছেন। লেখা মুখ বেঁকিয়েই ছিল।

পরিমলবাবু হঠাৎ যেন টের পেলেন পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে উঠছে, কুণ্ঠিত-কণ্ঠে বললেন—'বেশ, গান যদি না হয়, তবে নাচ হোক। লেখা নাচবে।'

জোরে জোরে মাথা নেড়ে লেখা বলল—'নাচ আমি ত জানি না।'

রেখা ভয় পেয়ে বসেছিল একটু দূরে, বলে উঠল—'এই। জানিস না? আলিবাবাতে সেবার আধঘণ্টা ধরে নাচল কে?'

লেখা আস্তে আস্তে বলল—দিদি তুই কিছু বুঝিস না। মার জ্বর হয়েছে না? ওঘরে চুপ করে শুয়ে আছেন। নাচানাচি করলে মার মাথাধরা বেড়ে যাবে না?'

—'অতএব গান হোক।' গর্জন করে বলে উঠলেন রবিদা, বশম্বদ পরিমলবাবু কোথা থেকে একটা হারমোনিয়ম টেনে আনলেন।

আমি সে গান শুনিনি। আমার মাথা ঘুরছিল। আমার ঘুম পেয়েছিল। আমি মেঘের স্তরে স্তরে উড়ছিলাম। ঢেউয়ের ঝাপটা খেয়ে আমি তলিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার নেশা হয়েছিল।

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, রাত। কত রাত কে জানে। জানলার পরদায় জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নায় বকুল ফুলের পুরানো গন্ধটা আরও যেন কড়া হয়ে উঠছে।

ঘরে বিজনদা নেই, পরিমলবাবুও না। সারা ফরাসে আবীর, থেঁতলান ফুল আর কাঁটলেটের কাঁটা ছড়ান। এত ফুর্তিকে সজাগ দেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সে-সব নিমেষে কি উবে গেল নাকি?

না। তখনও গান চলছিল। পা টিপে টিপে বাইরে গিয়ে দেখি, বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে রেখা আর রবিদা বসে। রেখা গান গাইছে।

সেখানে জ্যোৎস্নার আলো, অস্পষ্ট, তবু রেখার মুখখানা, মনে হল, যেন বড় ছোট যেন একেবারে এতটুকু। খোঁপায় একটি ফুলও নেই। চোখের মণির কালো এখন চোখের কোলের কালি। রেখা গান গাইছে, আর ঢুলছে, আবার গান গাইছে। গলা ভাঙা, বসে-যাওয়া, চড়ায় উঠলে চেরা-চেরা।

বুঝতে পারছিলুম, আর গাইতে পারছে না। একবার হাই তুলল রেখা, তুলল তো তুললই, মুখের হাঁ আর বোজে না, বুঝলুম, হাইটাই ওর দম! ওই ছুতোয় ও যতটা পারে দম নিচ্ছে। হাইটাকে আঁকড়ে ধরে, যতক্ষণ পারে গান থেকে ছুটি নিতে চায়।

কেননা, রবিদা ওকে ছুটি দেবেন না, তিনি খাবার আনিয়েছেন, গান শুনবেন বলে। ফরাসে ছড়ান হাড়গুলো তাঁর উদারতার সাক্ষী। পেট ভরে খেয়েছে, কাঁটা চুষেছে, এখন গান গাইতে হবে।

গাইতে হবে কেন, গাইছে। এই কয়েক ঘণ্টায় ক'খানা গান গেয়েছে রেখা, কে জানে। হয়ত পাঁচটা, হয়ত দশটা, পনেরটা, বিশটা। আরও গাইছে।

'এবার ঠুংরি হোক।'

'ঠুংরি গাইলুম ত একবার।'

'আবার গাও। এন্‌কোর।' রবিদাকে বলতে শুনলুম—'রেখা, তোমার গান গাইতে ভাল লাগে না? পার্ট করতে ত বেশ ভাল লাগে।'

ক্লান্ত, করুণ চোখ তুলে রেখা চাইল—'বিজনবাবু জোর করে পার্ট করান যে।' একটু থেমে বলল—'গান গাইতে ভাল লাগে,—লাগত। যখন শখ করে শিখেছিলাম, শখ করে গাইতাম। আর এখন—'

অত্যন্ত মৃদু একটা শব্দ হল, সেটা হাই না দীর্ঘশ্বাস, ধরতে পারলুম না। রেখা বোধহয় বলতে চেয়েছিল, গান এখন পেশা। নেশার জিনিষ বিষ হয়েছে।

ফরমাস চলল, ঠুংরির পর গজল, গজল শেষ হলে কীর্তন, কীর্তনের পর ভাটিয়ালী। রবিদা ওকে থামতে দিলেন না, তুষার-প্রান্তরে একটি নিরাবরণ মেয়েকে যেন চাবুক হাতে তাড়া করে ফিরলেন।

হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে রেখা আর্তনাদ করে উঠল - 'পারছি না রবিদা, আমি আর গাইতে পারছি না। খুব ঘুম পেয়েছে, সত্যি।'

বলেই হারমোনিয়াম খোলা রেখেই তার ডালার ওপরেই মাথাটা কাত করে দিল।

সেই মুহূর্তেই রবিদা ওকে একটা চিমটি কাটলেন। রেখা চমকে উঠল, চেঁচিয়ে উঠল, রবিদার নিষ্পলক চোখে যেন মৃত্যু দেখে ভয়ে চুপ করল। আবার টিপে ধরল হারমোনিয়ামের বেলো—ভীত, ভাঙা কর্কশ গলায় সুর তুলল। ফের ঠুংরি, ফের গজল।

আমি টলতে টলতে ঘরে ফিরে আবার শুয়ে পড়লুম।

* * * *

রিক্সায় করে রবিদার সঙ্গে ফিরছিলুম। ওপর দিকে চেয়ে বাড়ীটাকে সেদিন মনে হয়েছিল মাঝ-বয়সী মেয়ের বুক। মাঝবয়সী মেয়ের স্তনের মতই বিবর্ণ বড় চাঁদটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে। অনেক দূরে ক্যানেস্তারা পিটে পিটে কারা তখনও "হোলি হায়" করছে।

'আজকে আমাদের ওখানে চল'—রবিদা বললেন—'বাকী রাতটা ঘুমিয়ে নিয়ে কাল সকালে বাড়ি যাস। বানিয়ে যা হয় কিছু বলিস, নইলে বকুনি খাবি।'

কিছু বললাম না।

রবিদা আস্তে আস্তে বললেন—'কী-রে, কেমন লাগল?'

সংক্ষেপে বললাম—'ভাল।'

খুশী হয়ে রবিদা বললেন—'লাগবেই ত। আরে, এই হল আসল মজা।'

তারপরেও যেটুকু, রবিদা নিজেই বলে গেলেন। -'বিজন বাঁদরটা মাঝে তাল কেটে দিয়েছিল, নইলে দেখতিস, আরও জমত। খুব

জব্দ করেছি ওটাকে। তুই ত ঘুমিয়ে পড়লি, শেষে ও রাগ করে লেখা মেয়েটাকে নিয়েই বেরিয়ে পড়ল। আমি বাবা ঘাঁটি ছাড়িনি, কোর্ট ছাড়িনি। কড়ায় ক্রান্তিতে সব উশুল করে নিলুম।'

নিজের সাফল্যের কথা স্মরণ করেই যেন হেসে উঠে রবিদা আবার বললেন—'মেয়েটাও কম শয়তান নয়। কী করেছিল জানিস, ছুটো সন্দেশ হাতে করে একবার সরে পড়ছিল। আমি ওর হাত চেপে ধরে বললুম—উঁহুঁ, যা খাবে, এখানে বসে খেয়ে যাও। খেতে হল। ছুটো সন্দেশই। খানিক পরে আমাকে একটু অন্যমনস্ক যেই দেখেছে অমনি দেখি আবার ছুটো সন্দেশ আঁচলের তলায় লুকিয়েছে। মাথার ঠিক ছিল না ত, বললুম—চোর। একটা হালকা চড়ও কসিয়ে দিলুম। তখন কী বললে জানিস?'

আমি জানব বলেই রবিদার মুখের দিকে তাকালুম।

'বললে, আমার মা ত কাটলেট ছোঁয় না, মার জন্য নিয়ে যাচ্ছি।'

'মা—র—জ—ন্যে—নি—য়ে—যা—চ্ছি।' রবিদা দ্বিতীয়বার টেনে টেনে কথাটাকে উচ্চারণ করলেন, যেন বিদ্রূপ করতেই।

—বললেন—'আরে, আমার সঙ্গে চালাকি! বিজন ত লেখার সঙ্গে কেটে পড়ল, আমিও চলে আসছি, সিঁড়ি দিয়ে ছু'ধাপ নেমেছি-ও। রেখা করল কী জানিস? পিছন থেকে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, "ও রবিদা আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে অন্তত পাঁচটা টাকা দিয়ে যান।" পাঁচ টাকা? আজ সারা বিকেল যেখানে নোটের পর নোট উড়েছে, সেখানে মোটে পাঁচটা টাকা? হাঁড়ির খবর রাখি ত, বুঝলুম ব্যাপারটা। আজ না হয় কাটলেট খেয়ে পেট ভরেছিস, কাল খাবি কী। বাবা, ডাল-ভাত ত চাই। পাঁচটা টাকা পেলে, তবে ও রেশনের দোকানে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। ঝোপ বুঝে আমিও কোপ বসালুম।'

শিস দিলেন রবিদা, স্বুর ভেঁজে ভেঁজে যেন নিষ্ঠুর সেই সুখের স্বাদটা ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। শেষে বললেন—'আমি বললুম,

বেশ, টাকা নাও। ছুঁড়ে দিলুম, একখানা নোট। মুখের ওপর। বললুম, কিন্তু গান গেয়ে শোনাতে হবে। শোনাতে ওকে হলও। একটা নয়, ছুটো নয়, গুণে গুণে বিশটা। কম ঘুঘু নই ত, কড়ায় ক্রান্তিতে টাকাটা উশুল করে নিয়েছি। ওসব মেয়ে কী টাইপের, জানতে আমার বাকী নেই। সব কুত্তীর দাওয়াই জানি।'

একটা তুড়ি দিলেন রবিদা, ইঙ্গিত পেয়ে রিক্সা ওর বাসার দরজায় থামল।

শার্ট পরলুম, ঝুলটাকে ঠেলে দিলুম ট্রাউজারের নীচে, মনোযোগ দিয়ে সব ক'টা বোতাম আঁটলুম। এখন টাই পরছি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। আঁটুনি বজ্র হবে, কিন্তু গেরোটা ফসকা। কিন্তু নটটা মনোমত হচ্ছে না, অল্প অল্প ঘামছি। আমি ঘামছি আর রমা হাসছে। রমা আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে। এক্ষুনি বেরব শুনে তাড়াতাড়ি কফি করে এনেছে। হাত বাড়িয়ে ওর হাত থেকে পেয়ালা নিলুম, চুমুক দিতে জিভ পুড়ল, ওর হাতে কাপটা ফিরিয়ে দিলুম। রমার হাসির সঙ্গে এবার ধমক মিশল। বলল, 'এত তাড়াতাড়ি করছ কেন ?' ওর কথার জবাব না দিয়ে জানলার বাইরে তাকালুম। বেলা ফুরিয়ে এসেছে। অনেক দিন ধরে জলে ভেজা, রঙ-জ্বলা কাটা ঘুড়ির মত ফ্যাকাশে সূর্য এখনও রেন-ট্রি গাছটার মগডালে লটকে আছে। হাওয়ায় কাঁপছে, এখনই ডুববে। রমার দিকে ফিরে বললুম, অর্থাৎ বলতে চাইলুম, কেননা আমার স্বর আমার কানেই গেল না, তাড়াতাড়ি বেরতে হবে। দেখছ না, সন্ধে হয়ে এল ? কথাটা আমিই যখন শুনতে পাইনি, তখন রমাও অবশ্য পায়নি, কিন্তু আমার ঠোঁট নড়া থেকেই সে শব্দ ক-টাকে চিনে ফেলে থাকবে, তাকে বলতে শুনলুম, দেখছি। রমা তখনও হাসছিল, অনেক দূরে কয়েকটা জারজ পথ-কুকুর ডাকছিল থেকে থেকে, শেষ শীতের হাওয়া দিচ্ছিল। রমা কী দেখছিল, রমা কেন হাসছিল ? কিন্তু সব কেন নিয়ে নষ্ট করবার মত সময় হাতে নেই ; রমাকে বললুম আলো জ্বেলে দিতে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্রাশ হাতে তুলে নিলুম। মাথায় ছোঁয়াতে যাব, তখন দেখতে পেলুম আমিও। কপালের রগটার পাশে আরও তিন-চারটে পাকা চুল। ব্রাশ নামিয়ে টেবিলের টানা ধরে টানলুম। রমা তখনও হাসছিল, শব্দ

করে নয়, ঠোঁট টিপেও নয়, শুধু চোখ দিয়ে। বলল, 'কী খুঁজছ?' বললুম, 'শনটা।' আমার গলা এমন বিশ্রীভাবে ভাঙল কখন? রমাকে এগিয়ে আসতে দেখছি। শোবার ঘর, তাই ওর পায়ে চটি নেই, তাই শব্দ হল না। আমি একটু থতমত খেলুম, ভয় পেলুম। রমা এগিয়ে আসছে কেন, ওর মুখে কথা নেই কেন, ও হাত বাড়িয়েছে কেন? হাত বাড়িয়ে রমা আমার মাথা একটু নীচের দিকে টানল। কী চায়, কী করবে! আদর?—সে সবের পালা কবেই ত ফুরিয়েছে। আমার থুতনিতে রমার একটা হাত, আমার গা শিরশির করছে। সুখে নয়, অস্বস্তিতে। পাকা শিকারী যেমন নির্ভুল নিরিখ করে ট্রিগার টেপে, রমা ঠিক সেইভাবে ওর ডগা-খাওয়া আঙুল দিয়ে পাকা চুল তিনটেই তুলে আনল। আমাকে দেখিয়ে বলল, 'এই নিয়ে এই এক সপ্তাহেই বোধহয় গোটা তিরিশেক হ'ল। আর তুল না। থাক না। বেশ ত লাগছে দেখতে। এক দিকে পাকা চুল অন্য দিকে টাক, একসঙ্গে কতদিক সামলাবে তুমি।' হয়ত রমা এত কথা বলল না, আমি ওর মনের কথাটাই শুনতে পেলুম। বাইরে পা বাড়াচ্ছি, রমা আবার বলল, 'অফিস থেকে এসেই বেরচ্ছ, আর কিছু খেয়ে নিলে হত না?' পাছে আরও দেরি হয়ে যায়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলে বলে উঠলুম, 'না! অফিসেই টিফিন খেয়ে নিয়েছিলুম। এখনও ত অফিসের কাজেই যাচ্ছি। জরুরী কনফারেন্সে যাচ্ছি।' রমা এ কথাটার ওপর কোন মন্তব্য করল না। আমি ওর মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে চাইলাম। কোন ভাবান্তর নেই। রমা কি জানে, জরুরী কনফারেন্সের কথাটা মিথ্যা? রমা কি জানে, আমি কোথায় যাই? যাচাই করবার অবসর ছিল না। এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছে। দরজা বন্ধ করে দিতে বাইরে এসে রমা অস্ফুট গলায় একবার শুধু বলল, 'মাফলারটা নিলে ভাল করতে। আজকাল তোমার ত একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে।' সিগারেটের ধোঁয়া আর ওর কথাটা একই সঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে বললুম, 'আরে দূর দূর, আমার শরীর দিব্যি মজবুত আছে।'

রাস্তায় যখন পা দিলুম, তখনও কনকনে হাওয়া বইছিল, দূরের কুকুরগুলো বিশ্রী গলায় ডাকছিল।

* * * *

আমার জন্যে ওরা বসে থাকেনি, খেলা শুরু করে দিয়েছে। হাতঘড়ি দেখলুম। কই এমন কিছু দেরি ত হয় নি—ছটা বেজে এখন চল্লিশ মিনিট মোটে। সুমিতার সময় কি কাঁটায় কাঁটায় চলে? খানিক চলে, খানিক উঠে, সিঁড়ির ধাপে একটুখানি জিরয় না, দম নেয় না? সময়ের নিজের কি কখনও দম ফুরয় না? ব্যাডমিণ্টন কোর্টটা আলোয় উদ্ভাসিত—গোটা কয়েক চড়া বাল্‌ব জ্বলছে। সূর্যের কোটিতম কণা দিয়ে কি ওদের শরীর তৈরি? সুমিতা আমাকে একবার দেখল। বোধহয় একবার হাসল। একবারই। সুমিতা এখন খেলছে। সুমিতা আর তাকাল না। সুমিতা আর হাসল না। সুমিতা গোটা কোর্টে ছুটোছুটি করছে। সুমিতার কপালে ঘাম—ফোঁটা ফোঁটা ফোঁটা—টায়রার মত সাজান। আমি লনে বসে আছি। এখানে অন্ধকার। আমাব মাথায ফোঁটা ফোঁটা হিম পড়ছে। এখানেও থেকে থেকে কুকুরের ডাক শুনছি। তবে বোধ হয় বিলিতী কুকুর। অভিজাত পাড়া কিনা। অল্প অল্প মাথা ধরেছে যেন। হাঁটু কনকন করছে। মাফলার আনলে হত। রমা আনতে বলেছিল। সুমিতা এদিকেই আসছে। ধপ করে আমাব পাশের চেয়ারেই বসে পড়ল। সুপ্রিয় এল পিছে পিছে। সুমিতা কপালের ঘাম মুছছে। ওর দিকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস সরবত এগিয়ে দিলাম। বললাম, 'তুমি বোধ হয় ক্লান্ত?' সরবতে চুমুক দিতে দিতে সুমিতা আমার দিকে চুরি করে চাইল, বলল, 'না, মোটে ত এক সেট খেলেছি। এখুনি ক্লান্ত হব কী! আরও দু' চার গেম খেলতে উঠলুম বলে।' আমি কোন মন্তব্য করলুম না। বুকের ভিতরটা দুরদুর করছিল। জানি না, সুমিতা আমাকে পার্টনার হতে ডাকবে কি না। ডাকতে পারে কিন্তু। সুপ্রিয় একবার পার্টনার হয়েছে। এবার আমার পালা। কিন্তু যদি ডাকে, আমি কী

করব ? আমার যে হাঁটু কনকন করছে। কাঁধের কাছটাও কেমন ব্যথাব্যথা, ছুটোছুটি করা কি আমার সাজে !

সরবতের শূন্য গ্লাসটা আমার হাতে তুলে দিয়ে সুমিতা উঠে দাঁড়াল। আঁচলটা আঁটসাট করে বেঁধে নিল কোমরে। ফের খেলতে যাবে। আমিও কি উঠব, আমিও খেলব ? খেলব যদি সুমিতা আমাকে গ্লাস ধরতে দিল কেন। আমি এখন গ্লাস রাখি, না র‍্যাকেট তুলি ! কই, সুমিতা যে চলে যাচ্ছে, আমাকে ডাকল না ত। আমিই এগিয়ে গেলুম। পা টনটন করছিল, তবু যত তাড়াতাড়ি পারি, ওর পথ আগলে দাঁড়ালুম। বিদ্রোহীর মত নয়, প্রার্থীর মত। অত্যন্ত মৃদু, অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে বললুম, 'সুমিতা, আমি খেলব না ?' সুমিতা আমাকে পা থেকে মাথা অবধি একবার দেখে নিল। তারপর যেন পাশ কাটিয়ে ফের এগিয়ে যেতে চাইল। ওর কথা আমি শুনতে পেয়েছি। 'তুমি—তুমি কী খেলবে ! থেকে থেকে কাশছ, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছ না, কোমরের কাছটা বাঁকা, নাক ঝাড়তে বারবার পকেট থেকে রুমাল বের করছ—এই নিয়ে বোধহয় পাঁচবার হল। তুমি কি আজ খেলতে পারবে ? মোটেও যে দৌড়তে পার না তুমি—এ-বয়সে তোমার একদম দম নেই, তোমাকে পার্টনার নিলেই আমি হারি।' সুমিতা শুধু দৃষ্টি দিয়ে এত কথা বলল। দৃপ্ত উদ্ধত ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল।

আমি বসে রইলুম। অক্ষম ঈর্ষাতুর চোখে ওর আর সুপ্রিয়র খেলা দেখলুম। হিম পড়ছিল, আমি থেকে থেকে কাশছিলুম, আমার মাথা ধরেছিল, ভয় পেয়েছিলুম, ফুলে ফুলে-ওঠা কপালের রগ ছিঁড়ে ফেটে না পড়ে।

* * *

দরজা কে খুলে দিয়েছিল তা ত মনে নেই। বোধহয় রমা। রমা ট্যাক্সির শব্দ শুনে থাকবে। ট্যাক্সি-ভাড়া কে মিটিয়ে দিল ? বোধহয় আমি। আমার কিছু মনে নেই। রমা কি আমার জন্য বসে

ছিল? জেগে ছিল? আমি জানি না। আমি রমাকে দেখিনি, দেখতে পাইনি। আমার চোখ ঘোলাটে ছিল। আমার পা কাঁপছিল। গলায় প্রবল পিপাসা, মাথায় যন্ত্রণা—আমার হঠাৎ জ্বর হল কেন! বিছানায় শুয়েছি—তাও নিজের অজ্ঞাতসারে। কিংবা রমাই হয়ত শুইয়ে দিয়ে থাকবে। তারপর কী হল? আমি কি পিপাসার যন্ত্রণায় সারারাত এ-পাশ ও-পাশ করলুম? অথবা ঘুমিয়ে পড়েছিলুম? কী জানি।

আমি হয়ত সারারাত ভুল বকেও থাকতে পারি। রমা তখন কী করেছে—ও কি সমস্ত সময় আমার শিয়রে জেগে বসে ছিল? ও কি আমার কপালে জলপটি দিয়েছিল? প্রলাপে যা-যা বলেছি, ও কি ঠায় বসে সব শুনেছে? জেগে উঠে দেখছি, এখন সকাল। ভোরের প্রথম রোদ্দুর তার স্নিগ্ধ হাত আমার কপালে রেখেছে। সেই আলোয় রমার মমতামাখা মুখ দেখছি। কিন্তু আমার মুখ ত দেখতে পাচ্ছি না। আমি আমাকে দেখব। রমাকে ইশারা করে ডাকলুম। আয়নাটা এনে দাও—গলা চিরে এই কথা ক-টি ফুটে থাকবে। রমা বুঝল। আয়না এনে আমার হাতে দিল। আমি এখন আমাকে দেখছি। বিয়াল্লিশ বছরের পাকা, পুরনো একটি মুখকে। দেখছি নিষ্প্রভ দুটি চোখ। চিবুকে বয়সের থলথলে ভাঁজ। চোখের কোণে কাকের থাবার মত অনেক—অনেক রেখা। এক দিনের বাসী দাড়ি—কর্কশ, অমসৃণ। আর - আর কী? আর পাতলা-হয়ে-আসা এলোমেলো চুলের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা রুপোলী সুতো। এক রাতে এত চুল সাদা হয়ে গেল? মুখের ভিতরটা বিশ্রী, তেতো লাগছে। উঠে বসেছি। আয়নাটাকে ঠেস দিয়ে বালিশে। আমার হাত কাঁপছে, তবু পারব—সাদা চুল ক-টাকে—যারা আমার তারুণ্যকে বরফের গুঁড়োয় ঢেকে দিয়েছে—উপড়ে আনতে পারবই। পারলুম না ত, ফসকে গেল। সাদা চুল কটা নড়ে উঠল, যত ধরতে যাই, ততই যে সরে সরে যায়। এবার শক্ত মুঠোয় একটাকে চেপে ধরতে গেলুম। ওই পাকা

চুলটাই সবচেয়ে প্রকট, সবচেয়ে নির্লজ্জ। ধরা দিল না, মাথা নেড়ে আবার সরে গেল। আমার কম্পিত আঙুল ওর আপত্তিটা টের পেয়েছে। ও কী বলছে, আমি তাও শুনতে পেয়েছি। বলছে, তুল না, আমাদের তুল না। এখন আমাদের এত অপছন্দ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখ একটি কাঁচা চুলেরও যেদিন দেখা পাবে না, সেদিন আমরাই থাকব।

হাত সরিয়ে নিয়েছি। আয়নাটা ফিরিয়ে দিয়েছি রমাকে। রমা স্থির, স্নিগ্ধ আয়ত চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার শিয়রে বসেছে। ওর শীতল করতলের নীচে পাকা চুলটা এখন চুপ করে আছে। রমাও থাকবে।

শেষ মিষ্টিটা পাত থেকে তুলে নিয়েই নিশীথের মনে হল তার ঘুম পেয়েছে। হাই তুলল, সেই হাই ঢাকতে হাত তুলল মুখের সামনে। ঢেঁকুরও উঠছিল, সেটা চাপল আর দু-ঢোঁক জল খেয়ে। নাঃ, আজ খাওয়াটা বড়ই বেশী হয়ে গিয়েছে। চোখের পাতা ভারী, ঘুম পেয়েছে, এদিকে গায়ের জামাও ভিজে শপশপে। বাসায় ফিরে চৌবাচ্চায় জল পাই তো, মাথায় ঢেলে শুতে যাব।

রেকাব থেকে পান তুলেই নিশীথ সরে পড়ছিল, অন্য সকলে যখন নতুন বউ দেখবে বলে দরজায় ভিড় করেছে, সেই অবসরে। তার সামান্য উপহার, প্যাকে-মোড়া বই, সে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। পান চিবুতে গিয়ে ফোঁটাকয়েক কষ পড়ল জামার আস্তিনে। আহা, একটু লেবু পাই তো, বেশ হয়, লেবুর রসে শুনেছি দাগ যায়। নইলে কাল অফিসে যাবার সময় আবার নতুন জামার দরকার হবে। কাল সকালে লণ্ড্রী খোলা পেলে হয়।

ঘুম পেয়েছিল, পানের ছোপ-লাগা আস্তিনটার জন্য মন খুঁতখুঁত করছিল, কোঁচা তুলে সাবধানে পা বাড়িয়ে নিশীথ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিল। কোমরে আঁচল-জড়ানো ব্যস্ত যে-মেয়েটি তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিল, তাকে সে দেখতে পায়নি। দেখতে যখন পেল, তখন সসঙ্কোচে সিঁড়ির ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। চিনতে পারেনি। চশমার কাচ বোধহয় ঝাপসা ছিল।

চিনল লীলাই, চাপা-সহর্ষ গলায় বলে উঠল, 'নিশীথ-দা! বা-রে, এসে দেখা না করেই যে পালাচ্ছেন বড়?'

নিশীথ তখনও আড়ষ্ট, বলতে গেল, 'ঘুম পেয়েছে', কিন্তু কথাটা ছেলেমানুষি শোনাবে ভেবে বলে বসল, 'লীলা লেবু আছে?' প্রশ্নটা আরও হাস্যকর শোনাল।

'লেবু?' লীলা বিস্মিত হয়ে তাকাল চোখ তুলে।

মূক নাটকের অভিনেতার মতো নিশীথ তখন আঙুল দিয়ে ওর জামার আস্তিনের ছোপ-ধরা জায়গাটা দেখিয়ে দিল।

লীলা বুঝল। হেসে বলল, 'আসুন, ওপরে আসুন।'

অগত্যা নিশীথকেও লীলার পিছন-পিছন ওপরে উঠতে হল। ছিপছিপে যে মেয়েটি তরতর করে সিঁড়ি ভাঙে, তার সঙ্গে সে পাল্লা দিয়ে পারবে কেন। আট-দশটা সিঁড়ি ভাঙতেই নিশীথের হাঁপ ধরে গিয়েছিল। একটু বিরক্ত সে হয়েছিল, নিজের উপরে, কিংবা লীলার উপরেও।

ও বুঝছে না কেন, আমি ক্লান্ত, আমার চোখের পাতা ভারী, আমার ঘুম পেয়েছে? মনে মনে বকছিল লীলাকে, ফাঁকে ফাঁকে নিজেকেও। জামায় দাগ লেগেছিল, আমি কেন এই সামান্য ব্যাপারটা ওকে বলতে গেলুম। এখন কে জানে, লেবু খুঁজে পেতে কত দেরী হবে, না জানি, এক-শরীর অবসাদ আর এক-চোখ ঘুম নিয়ে এখানে আরও কতক্ষণ আটকে থাকব, ওরা সবাই চলে যাবে, আমি যাব না, ওরা ট্রাম পাবে, আমি পাব না, আমাকে হয়ত রিকশা নিতে হবে, ছয় আনা। অন্যমনস্কভাবে পকেটে হাত চালিয়ে নিশীথ খুচরো পয়সাগুলো নাড়াচাড়া করল।

লীলা ওকে নিয়ে গেল বারান্দার এক কোণে, ওখানে নির্জন একটা কল আছে। এখানে কম পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছে, চড়া বাল্‌ব দেয়নি কেন, তা ওরাই জানে। একটা সিঁড়ি সোজা উঠে গিয়েছে ছাতের দিকে। নিশীথ হাত পাতল কলের নীচে, আস্তিনটা টান টান করে ধরে লেবু নিংড়ে লীলা ছড়িয়ে দিল রস, আর তখনই নিশীথ ওর খোঁপায় গোঁজা বেলফুলের মালার গন্ধ পেল।

এই গন্ধ এতক্ষণ পায়নি কেন?

পায়নি এইজন্য যে, ওদিকে অনেক লোক ছিল, তাদের গলা, বিয়ে-বাড়ির সমবেত উত্তেজনা গমগম করছিল। ওদিকে হাজার-পাওয়ারের বাতি জ্বলছিল। কড়া আলো আর চড়া আওয়াজে কি

গন্ধও ঢাকে ? বোধহয় ঢাকে, নইলে নিশীথ লীলার খোঁপায় বেলফুলের অস্তিত্ব টের পায়নি কেন।

পিপাসা পেয়েছিল, নিশীথ আঁজলা পেতে ওই কলেরই জল খেয়ে নিল। রুমালে ঠোঁট মুছে, লীলাকে বলল, 'এবার যাই।'

কারণ হিসাবে জুড়ে দিতে পারত ঘুম পেয়েছে, কিন্তু দিল না, কেননা কথাটা এবারে মিথ্যে হত। অথচ মাত্র এই মিনিট কয়েক আগেও সত্যি ছিল। তখন সত্যিই চোখ ঢুলঢুল ছিল, এখন নেই। ঘুম ছুটে গিয়েছে। অন্যান্য নিমন্ত্রিতরাও বোধহয় একে একে বিদায় নিল এতক্ষণে।

লীলা বলল, 'নিশীথদা, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

'বল।'

'এখানটা বড় গরম, চলুন না ওপরে যাই।'

নিশীথ বলল, 'চল।' খুব ঠাণ্ডা স্বরে, নিজেকে যেন নিয়তির হাতে সঁপে দিয়েছে, এমন সুরে।

সিঁড়ি দিয়ে ছাদের দিকে উঠে গেল লীলা, আগেব মতই তরতর করে, নিশীথ তখন রাগ করল। ও বোঝে না কেন, আমি পাল্লা দিতে পারি না, ভারী হয়েছি। তাতে আবাব ভরপেট খেয়েছি, আমি ত হাঁপাবই। তা ছাড়া এই যে অন্ধকার সিঁড়ি—এ-ও কি আমার চেনা ! ছাতে গিয়েও কে জানে, কত ভূমিকা কববে মেযেটা, ততক্ষণে পথ নির্জন হবে, ট্রাম বন্ধ হবে, রিকশা করে গিয়েও হয়ত দবজা খোলা পাব না, রেবা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়বে।

বেশী ভূমিকা কিন্তু লীলা করল না, খুব স্পষ্ট গলায় বলল, 'নিশীথদা, আপনার ওপর আমি খুব রাগ করেছি।'

নিশীথ না বুঝে চেয়ে রইল।

লীলা বলল, 'নিশীথদা, আপনার সঙ্গে শেষবার দেখা হয়েছিল আট মাস আগে, মনে আছে ? এই আট মাস আপনি আমাকে খুউব কষ্ট দিয়েছেন।'

গম্ভীর গলা নয়, বরং চপল, যেন সামান্য দুষ্টুমি মেশানো।

নিশীথ-ই আড়ষ্ট হয়ে উঠছিল। বোকা-বোকা ভাবে, ঠেকে-যাওয়া গলায় বলল, 'লীলা, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

লীলা বলল, 'আপনি কী সাংঘাতিক লোক বলুন তো!'

হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নিশীথ বলল, 'লীলা, আমার সময় বেশি নেই, অনেক রাত হল। কাল সকালে অফিস। হেঁয়ালি কোরো না।'

'হেঁয়ালি?' লীলা এবার বুঝি সত্যিই রাগ করল। —'হেঁয়ালি আমি করলাম, না আপনি? মনে আছে, আট মাস আগে, এইখানে —এমন সময়ে—'

কথাটা শেষ না করে লীলা হাসছিল। নিশীথ বলল, 'এমন সময়ে কী, লীলা?'

'কী, তা আমিই জানিনা যে। আপনি বলেছিলেন, আমার সঙ্গে একটা কথা আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী কথা? আপনি বললেন, একটু পরে বলছি। আমার, জানের তো, কৌতূহল খুব বেশী? আবার বললাম, বলুনই না, নিশীথদা, কথাটা কেমন, ভালো না খারাপ? আপনি মুচকে হাসতে থাকলেন। বললেন, অত ব্যস্ত কেন, বলছি, একগ্লাস জল এনে দাও দেখি। এইটুকু জেনে রাখ, খুব বড় খবর। বললাম, শুনে কি আমার মাথা ঘুরে যাবে? আপনি হাসতে-হাসতেই বললেন, যেতেও পারে। আমি জল আনতে নামলুম। ফিরে এসে দেখি, আপনি নেই। শুনলাম, আপনাকে কারা ডেকে নিয়ে গেছে। তারপর আপনি তো কলকাতাও ছাড়লেন, আর দেখাই হল না। সেই থেকে নিশীথদা, আমি ভেবে মরছি আর কষ্ট পাচ্ছি। কী বলতে চেয়েছিলেন, বলুন তো?'

নিশীথ কিছুক্ষণ খুঁজে খুঁজে মনের ভিতরটা তোলপাড় করল। বলল, 'কই মনে নেই তো?'

'মনে নেই?' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে লীলা বলল।

'বিশ্বাস কর, কিচ্ছু মনে পড়ছে না।'

লীলা পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। বলল, 'বেশ, তবে যান। অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম, কিছু মনে করবেন না। আসলে

আপনার মতলব আমি ধরে ফেলেছি, নিশীথদা। আপনি সাংঘাতিক লোক। আপনি আমার কৌতূহলটাকে জীইয়ে রাখতে চান। চান যে, আমি রোজই কী-কথা বলতে চেয়েছিলেন, সেই কথাটাই ভেবে মরি।'

রিকশা করে ফিরছিল নিশীথ। কিছু বেশি পয়সা গেল, কিন্তু এই চলার ছন্দ মন্দ না, ঠুনঠুন ঘন্টি শুনতে খারাপ না।

লীলা বিশ্বাস করেনি, কিন্তু তার সত্যিই কিছু মনে নেই।

সত্যিই সে লীলাকে কিছু বলতে চেয়েছিল কি? মনে পড়ে না তো। বলতে যে চেয়েছিল সেই মানুষটাই আজ নেই যে। যে-আলোতে বলেছিল, সেই আলো সেই মুহূর্তটিকে নিয়ে লক্ষ-কোটি যোজন দূরে চলে গিয়েছে। কোনো মন্ত্রবলে সেখানে পৌঁছান যদি সম্ভব হত, তবে হয়ত সেই হারানো মুহূর্তটির সঙ্গে হারানো কথাটিকেও খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু এই মাটিতে দাঁড়িয়ে তা তো আর সম্ভব নয়!

আবার এ ও হতে পারে, নিশীথ ভাবল, আসলে কোনো কথা নেই, কোনো কথা ছিলও না, সবটাই লীলার বানানো—দুষ্টুমি। নিজে সে কিছুমাত্র কষ্ট পায়নি, কিন্তু ওই একটি কথা বলে চিরদিনের মত আমাকে ভাবিয়ে তুলল: কী বলতে চেয়েছিলাম, সত্যিই কিছু বলতে চেয়েছিলাম কি?

সারা জীবন অনেক কথা বলব, অজস্র অনর্গল কথা, আমার উপর-ওয়ালার সঙ্গে, দোকানীর সঙ্গে, ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু সব কথা বলা হলে, যে-কথাটি বলা হয়নি, রাত্রে সেই কথাটিকে খুঁজব, ভাবব।

এই ভাবা আর খোঁজা আর কষ্টটুকু থাকবে বলেই আমি একেবারে সামান্য হয়ে যাব না, বেঁচে থাকার অন্তত একটা মানে, একটু স্বাদ পাব।

এই স্বাদটুকু তাকে দিয়েছে বলেই দশটা-পাঁচটার কেরানী, সংসারী নিশীথ লীলার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল।

[এক]

চেপে বৃষ্টি আসছে, রিক্‌শওয়ালা, আরেকটু জোরে চল না। আজও বেলা যেতে-না-যেতে, অফিস ছুটি হতে-না-হতে, আষাঢ়-আকাশের মুখ কালো হয়ে এল, আমার ভয় করছে।

আজও আমার বাসায় ফিরতে দেরী হবে। আমি ভিজব। ওষুধটা কেনা হবে না। বকুনি, হাঁ হয়ত বকুনিও খাব।

বকুনিকে আমি ভয় করিনে। সয়ে গেছে, গায়ে লাগে না। ভয় করি ভেজাটাকে। বুকে জল বসে যায়, কাশি হয়, জ্বর জ্বর লাগে। অফিস কামাই হয়, মাইনে কাটে।

তা-ছাড়া সে-বয়স কি আর আছে, যখন 'আয় বৃষ্টি চেপে' বলে উঠোনে ছুটোছুটি করতে ভাল লাগত। ফ্রক ভিজত, বিনুনি, ঢিলে হত, শিলের নুড়ি কোঁচড় ছাপিয়ে যেত।

এখন শরীরে সয় না। সইলেও লোকে নিন্দে করে। কিংবা, লোকের যদি-বা মুখ বন্ধ থাকে, আমার স্বামীর থাকে না। খুব বকে। পান থেকে চুন খসার চেয়েও তুচ্ছ কারণে। ওর চোখের জ্যোতি কম, এমনিতেই মিটমিট করে, রাগলে আরও যেন ছোট হয়ে যায়। জ্বলেও। হলদে-ঘেঁষা সবুজ রঙের একটা আলো ওর মণিতে ফস করে ওঠে, আমি দেখছি। ঠোঁট দু'টি থেকে থেকে নড়ে, তারপর বসে-যাওয়া গলায় কথার তুবড়ি ছোটে। যা-তা বলে, বলেই চলে। সে-সব বড় বিশ্রী কথা, রিক্‌শওয়ালা, তোমাকে আমি বলতে পারব না।

তার চেয়ে তুমি একটু জোর কদমে চল। ডান হাতে ঘুন্টিটা ঠুন ঠুন কর, ওরা পথ ছেড়ে দেবে। এই তো ট্রামটা দাঁড়িয়ে গেছে, তুমি এই ফাঁকে ওর পাশ কাটিয়ে, বাঁ-ধার ঘেঁষে বেরিয়ে

যাও। ওই দেখ, কোথা থেকে একটা ঠেলা-ওয়ালা হুমড়ি খেয়ে সামনে এসে পড়ল। আর ত তুমি পথ পাবে না। দেখছ না; মোড়ের মাথায় সবুজ ঘুচে লাল আলো জ্বলেছে, সঙ্গে সঙ্গে দামী ভারী অহঙ্কারী গাড়িগুলো সারে সারে দাঁড়িয়ে গেল, তুমি তো সামান্য রিক্‌শওয়ালা, সব চেয়ে ছোট্ট, হাল্‌কা, সবচেয়ে ধীরে চল। তোমাব অধীর হওয়া সাজেই না।

বরং তোমার চিটচিটে গামছাটায় ততক্ষণ মুখটা মুছে নাও। মুখ, ঘাড়, পিঠ। ঘামে যে নেয়ে উঠেছ, তোমাদের মেহনৎ ত কম না। ভালো করে মুছে নাও, ফের দৌড়ন আছে। ট্রামটার পাশ কাটাতে অত করে বললুম, পাবলে না, নাকি সাহসই পেলে না, এখন জিবোও এখানে পাক্কা এক মিনিট। যতক্ষণ না সবুজ আলোর অনুমতি মেলে।

আমার আজও আট আনা বাজে খরচ হ'ল। অফিস থেকে বের হতেই ছ'টা বাজল, বড় সেই ইঁদুর-ধরা কল, ওরা যাকে বলে লিফ্‌ট, সেটা যে আজ বিগড়ে আছে, তা কি জানি। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। শেষটা নামতে হ'ল সিঁড়ি দিয়ে। ছ' তলা থেকে একতলা। এখানটা অন্ধকাব, ওখানটা বাঁকানো, তাড়াতাড়ি নামছি, মনে ভয়, পাছে পা হড়কে পড়ে না যাই। শাড়িটাকে আলগোছে গোড়ালির খানিকটা উপবে তুলেও নিয়েছি। কেউ দেখেনি, অবশ্য। একে আবছায়া, তাতে সকলেরই ঘরে ফেরার তাড়া, কে কার দিকে তখন চেয়ে দেখে।

দেখি, রাস্তায় তখন ট্রাম-বাসে ঠাসাঠাসি ভীড় শুরু হযে গেছে। একেকটা গাড়ি এসে দাঁড়ায়, আর একেকটা ঢেউ তার উপরে আছড়ে পড়ে, আবার সেই ঢেউ ফিরেও আসে। জনসমুদ্র বলে চল্‌তি একটা কথা আছে না? ওটা একেবারে বানানো নয়। একটা উপায় ছিল, লালদীঘি ঘুবে ফিরে আসা, কিন্তু তাতে অনেক দেরি হয়ে যেত, আমাকে যে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

ফিরতেই হবে। পথে ওষুধ কিনে নেব, আমার স্বামীর জন্যে, আর কিছু ফল। প্রেস্‌কৃপশন আমার ঝুলিতেই আছে।

মাথা তুলে ওপরে চাইলুম, দেখি আষাঢ়-আকাশের মুখ কালো হয়ে এসেছে। কয়েকটা কাক দল বেঁধে চক্রাকারে ঘুরছে। আমার ভয় করল। তাড়াতাড়ি তোমাকে ইশারায় ডাকলুম। পটলডাঙার গলিতে যেতে হবে, কত নেবে। তুমি বললে, দশ আনা। শেষটায় আট আনায় রফা হ'ল।

তুমি জান না রিক্‌শওয়ালা, এই আট আনা আমার কাছে কতখানি। আমার তিন দিনের টিফিন। আমার দু' দিনের ইলেক্‌ট্রিক বিল। রোজ বাড়ি ফিরতে যদি এমনি রিকশা চাপতে হয় তবে আমি ফতুর হয়ে যাব, চাকরি করার মজুরি পোষাবে না। এ-সব শখ এক আধ দিনই সাজে।

তুমি বড় তাড়াতাড়ি করছ, একেবারে বেপরোয়া চলছ। এই যে দোতলা বাসটা আমাদের ধার ঘেঁষে ছিটকে বেরিয়ে গেল, ওটা যদি হুড়মুড় করে ঘাড়ে এসে পড়ত? এখনও আমার বুক ধড়ফড় করছে। না—না, তাড়াতাড়ি যেতে হবে বৈকি, তাই বলে এম্বুলেন্সে ওঠা কোন কাজের কথা নয়। আর একটু হলেই দুর্ঘটনার রিপোর্টে নাম উঠে যেত, মান যেত, হয়ত-বা প্রাণটাও। তার চেয়ে তুমি বরং একটু দেখে শুনে চল।

আমার স্বামী বকবে? তা দেখ, ও এমনিও বকবে, অমনিও বকবে। ছোট্ট ঘরখানায় দিনরাত শুয়ে থেকে থেকে ওর মনটাও ছোট হয়ে গেছে। জানলা খোলে না, খুলতে দেয় না, আকাশ দেখে না। ওর ভয়, ঠাণ্ডা লেগে অসুখটা আরও বাড়বে। শুয়ে শুয়ে পড়ে শুধু জ্বরের চার্ট, থেকে থেকে নিজের নাড়ী টিপে দেখে। ওর শিয়রের থালি, ভর্তি নানা শিশি বোতলের আড়ালে আছে একটা ঘড়ি, সেটা দিনরাত টিকটিক করে চলে। পৃথিবী যতক্ষণে একবার ঘোরে, ওই ঘড়িটার ছোট কাঁটা ততক্ষণে নির্ভুলভাবে দু'বার ঘুরে আসে।

ঘড়িটাতে দম দিতে ওর কোন দিন ভুল হয় না। হাত বাড়িয়ে ওটাকে তুলে নেয়, কাচটায় আঙুল ঘষে, কানের কাছে ধরে, শোনে

ওটা চলছে কিনা, চোখ পিটপিট করে দেখে কোন্ কাঁটাটা কোন্‌খানে।

যেন ওর প্রাণটা ছোট হতে হতে ওই ঘড়িটার ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছে, যেন ঘড়িটার আর ওর হৃৎপিণ্ডের একই চলার নিয়ম।

সময়ে অসময়ে ত ঘড়ি দেখছেই, তবু দিনে দু'বার ও বিশেষ করে ঘড়ি দেখে। একবার, আমি যখন অফিসে যাব বলে বেরিয়ে আসি। দ্বিতীয়বার, আমি ফিরলে। কী অদ্ভুত, ঠাণ্ডা দৃষ্টি, রিক্‌শওয়ালা, ওর সে-চোখ তুমি দেখনি। দেখলে, তোমারও বুক হিম হয়ে যেত। মানুষের চোখ অত স্থির, নিষ্ঠুর, শীতল হয় না।

এক একদিন ভাবি, ওর হাত থেকে কেড়ে ঘড়িটাকে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিই। কিংবা আছড়ে ফেলি মেঝেয়, সন্দেহের ওই ছোট যন্ত্রটা চুরমার হয়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক।

কিন্তু করিনে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলি, কাজ বেশি ছিল, তাই দেরি হয়ে গেল। তুমি ওষুধটা সময়মত খেয়েছ?

ও কিছু বলে না। একবাব দু'বার পলক পড়ে। পাশ ফিরে শোয়। ঘন ঘন শ্বাস ফেলে। বুঝি, ও রাগটাকে সামলে নিচ্ছে। তখন ওর পাঁজরের হাড় ক'খানাও গোনা যায়। ঘাড়টা উপোসী মোরগের মত শুকনো। ইচ্ছে হলে আমি তখন ওকে—

থাক, বলব না কী। ওসব চিন্তা মনেও আনতে নেই। তুমি এইটুকু জেনে রাখ, ওর চেয়ে গায়ে আমার জোর অনেক বেশি।

তুমি বলবে, তবু ভয় পাই কেন? আমি নিজেও জানি না, কেন। ঠিক বুঝতে পারি না। এক এক সময়ে ভাবি, সত্যিই ভয় পাই কি? ছোট ঘরে, ছোট মনে, ছোট সন্দেহ নিয়ে যে লোকটা অহোরাত্র নাড়াচাড়া করছে, তাকে ভয় পাবার কী আছে? ও নিজে কষ্ট পায়, আমাকেও দেয়।

রোজ অফিসে যাব বলে তৈরি হয়ে যেই ওর ঘরে ঢুকি, ও তখন আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। কোন্ শাড়িটা পরলুম, ব্লাউজটা

কী রঙের, খোঁপায় ফুল আছে কিনা, কাজল পরিয়ে চোখ দুটিতে কতখানি ইশারার রহস্য আনলুম, কপালের ফোঁটাটা সিঁদুরের না কুঙ্কুমের—এইসব। আমার গা রী-রী করে। সে-দৃষ্টি কেমন, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। কামনা? না-না, কামনা না। ও আমাকে কামনা করে না, করলে আর এমন দোষ কী, সে অধিকার ওর তো আছেই। আসলে ও তখন পরপুরুষ হয়ে যায়। পরপুরুষের চোখ দিয়ে আমাকে যাচাই করে। রাস্তার লোকের কাছে আমি কতটা লোভনীয় হয়ে উঠেছি, সেটা পরখ করবার জন্যে নিজেই রাস্তার লোকের মত ইতর হয়ে যায়।

তারপর করে কী, শিয়রের কাছ থেকে সেই হাতঘড়িটা বার করে। সময় দেখে। যতটাই বাজুক, গলায় শ্লেষ ঢেলে একবার বলেই, 'এত শীগ্‌গির?'

আর যখন বাসায় ফিরি, তখনও আরেকবার সেই পরীক্ষক চোখ বুলিয়ে আমাকে দেখে। যদি তাড়াতাড়ি ফিরি, তবু বিশ্রী ভঙ্গিতে হেসে বলেই, 'এত দেরি?'

আসল কথা কী, জান, আমাকে চাকরি করতে দিতেই ও চায়নি। বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যেই অক্ষম হয়ে বিছানা নিল, টেনেটুনে চালিয়ে দিলাম আরও এক বছর। শেষে দেখি, আর ত চলে না, ওর দিকে চাই, সেরে ওঠার কোন লক্ষণ দেখি না। বলি, 'আমি একটা কিছু করি না? লেখাপড়া কিছু তো শিখেছিলাম সেটা এবার কাজে লাগুক।'

ও বলত, 'সবুর। নতুন মালিশটা আনিয়ে দাও, দেখবে আমি দু, মাসে চাঙ্গা হয়ে উঠেছি।'

খোনা-খোনা গলা, ভুগে-ভুগে সরু ইনিয়ে-বিনিয়ে আরও কত কী যে বলত। 'তুমি গেলে আমাকে শুশ্রূষা কে করবে।' বলত, 'বুঝি, বুঝি, ঘরে এখন আর মন টেকে না।'

ওর ভয় ছিল, বাইরে বেরুলেই আমি বুঝি খারাপ হয়ে যাব। এই ভয়টাকে ও ভালবেসে পুষেছিল। প্রথমে ওটা ছিল নিরীহ

শ্বাপদ-শিশুর মত। পরে তার নখে ধার হ'ল, দাঁত বসাতে শিখল, আঁচড়ে কামড়ে আমার স্বামীর মনের ভিতরটা রক্তাক্ত করে দিতে লাগল, তবু, পোষা জিনিসের এমনই মায়া, ভয়টাকে ও তাড়াতে পারল না কিছুতে। তাকে পুষে রাখলই।

অথচ দেখ, এটুকু ওর বোঝবার শক্তি নেই যে, মেয়েমানুষ শুধু বাইরে বের হলেই খারাপ হয় না। যারা হয়, তারা ঘরে বসেও হতে পারে। ওর নিজের খুড়তুতো বোনই তো—

থাক, সেসব ঘরের কেলেঙ্কারির কথা তোমাকে বলে কাজ নেই।

আমি এ-কথাও বলি না যে, পথের বিপদ কিছু নেই। আছে। ভাল মন্দ দুই-ই আছে। আর, বলতে পারিনে, মন্দরাই হয়ত দলে ভারী। প্রথম প্রথম কী যে অস্বস্তি হত, কত লোক যে পিছু নিত, শিস দিত, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। বাস থেকে আমাদের গলির বাসায় যেতে লাগে তো মোটে মিনিট চারেক, তবু কোন কোনদিন তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে শাড়িতে পা জড়িয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি। ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছি, আর মনে মনে বলেছি, ঈশ্বর, এই পথটুকু আমাকে ভালয় ভালয় পার করে দাও।

সেই সব লোকেরা এখনও একেবারে উধাও হয়নি। এখন আমার সাহস বেড়েছে, কিন্তু দুঃসাহসী ত ওদের ভিতরেও আছে নিরুপায় ঘৃণায় জ্বলি। যেদিন ডাকের চিঠিতে, চাকরি পেয়েছি, এই খবরটা আসে, সেদিনকার কথা মনে পড়ে যায়। আমার স্বামী চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে ফেলেছিল। আমার কবৃজিটা চেপে ধরেছিল প্রাণপণ জোরে। হিংস্র ভঙ্গিতে বলেছিল, পারবে না পারবে না তুমি এই চাকরিতে যেতে। ভাবি, সেদিন ওর কথাটা মেনে নিলেই যেন ভাল হত। এই নিত্য-নিগ্রহের হাত থেকে রেহাই পেতুম। না হয় উপোস করতে হত, তবু স্বামীসেবা করে মরে গিয়ে স্বর্গে তো যেতুম।

রিক্‌শওয়ালা, হঠাৎ কেমন ঠাণ্ডা হাওয়া দিল দেখ, এই শুকনো শিরীষ গাছটার রাশি রাশি পাতা মাথার উপরে তুলে অদৃশ্য কারা হরিরলুট দিল। টপ টপ বৃষ্টি পড়ছে, এবার তোমার চলা একটুখানি থামাও, পরদাটা নামাও, কষে বাঁধ। আমি একটু শক্ত হয়ে বসি।

কিন্তু বৃষ্টির ছাঁট কি ছাই বাঁধা-ছাঁদা মানে! সব ভিজে গেল যে, আমার পায়ের পাতা, জামা, আঁচল-কাঁচল, সব। কপালের কুঁড়ির মত ফোঁটাটা গলে গলে এতক্ষণে বুঝি রক্তজবা হ'ল। মুঠো করে পরদাটা টেনে ধরেছি তবু সামলাতে পারছি না।

রিক্‌শওয়ালা, এবারে থামো, এই ঢাকা বারান্দার নিচে খানিক দাঁড়াই।

[দুই]

চাকাটা না হয় বুঝলুম গাড়িটাকে ঠিক পথে রাখবার জন্যে, ট্যাক্সিওয়ালা, তোমার এই আয়নাটা রেখেছ কেন? ছোট্ট এক টুকরো কাচ, ওর ভিতর দিয়ে তুমি কি বিশ্বরূপ দেখ? আপাতত তুমি কিন্তু আমাকে দেখছ। আয়নাটাকে ঘুরিয়ে নাও না, শক্ত করে স্টিয়ারিং ধর, নইলে একটা এ্যাকসিডেণ্ট ঘটতে পারে।

তা-ছাড়া দেখছই বা কী, আর ঠোঁট টিপে টিপে হাসছই বা কেন। তোমার গাড়িতে এর আগে কোন মেয়ে কি ওঠেনি। এই হাতল ঘুরিয়ে কত জনকে দিনরাত খেয়া পার করে দিচ্ছ। তোমাদের ত ওই কাজ।

বুঝেছি, তুমি আমাকে দেখছ না, অন্তত আলাদা করে না। দেখছ পাশের এই লোকটির সঙ্গে মিলিয়ে। ভাবছ, ও আমার কে?

যদি বলি, ওই আমার স্বামী!

বিশ্বাসই করবে না। তোমাদের ঝানু চোখ, এক নজরেই টের পাও কোন্ জাতের সওয়ারি। স্বামী-স্ত্রীর ধরন-ধারনই

আলাদা। লুকোব না, লুকোতে পারবও না, আমরা শুধু একে আরেক জনের চেনা।

স্বামী-স্ত্রী হ'লে, এতক্ষণ আমি কলকল গলায় অনর্গল কথা বলতুম, ও গম্ভীর হয়ে শুনত। স্বামীরা তাই করে। কী বিছানায়, কী রাস্তায়, হঁ-হাঁ করে কোনমতে ঠেকা দিয়ে যায়। দোকানে দোকানে যত রকমারি বেশাতি, ওরা কিচ্ছু দেখে না। অন্যদের দেখতে দেয়ও না। বোধহয় মনে মনে হিসাব করতে থাকে, কত খরচ হ'ল, আরও না-জানি কত হবে। আর মাঝে মাঝে তাড়া দিয়ে বলে, 'চল, চল।'

বউয়েরা অত সহজে চলবে কেন। সবে খাঁচার বাইরে খোলা আকাশের নিচে এসেছে, এখন চোখ দিয়ে সব চেটেপুটে নেবে, যতটা পারে।

এই লোকটি কিন্তু আমার স্বামী নয়। দেখছ না, আমি দরজার কাছ-ঘেঁষে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছি, আর নিশিবাবু, ওই লোকটির নাম, মাঝে মাঝে সন্তর্পণে হাত বাড়িয়ে আমার আঙুল ছুঁতে চাইছেন। আমি সরিয়ে দিচ্ছি বটে, কিন্তু সত্যি কথা বলব?—আবার কখন হাতটা এগিয়ে আসবে, তার প্রতীক্ষাও করছি।

বাড়াবাড়ি কিছুই তো করছিনে।

তোমাদের ট্যাক্সিতেই, শুনেছি, এর চেয়ে ঢের বেশি গোলমেলে কাণ্ড ঘটে থাকে। গাড়ি নাকি খুব দূরে দূরে নিয়ে যাও, দাঁড় করিয়ে দাও নির্জন জায়গা দেখে, কখনও কখনও বেরিয়ে গিয়ে সিগারেট ধরাও। মীটারে ভাড়া বাড়ে। কিন্তু গাড়িতে যারা রইল, তারা কি দু-চার টাকার পরোয়া করে!

কিন্তু আমি তো সেরকম মেয়ে নই। অফিসে কাজ করি, স্বামীর সেবা করি, সংসারও চালাই।

ভাবছ, তবু আমি আজ ট্যাক্সিতে উঠলুম কেন। নিশিবাবুর সঙ্গে কেন?

কেন, বলি শোন। এর মধ্যে কোন যোগ-সাজসের ব্যাপার নেই। অফিস থেকে বেরিয়ে দেখি, আকাশে ঘন কালো মেঘ। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, আমার স্বামীর ওষুধ কিনতে হবে। প্রমাদ গণলাম। ট্রামে তো ওঠবার জো নেই, অন্যদিন স্যাণ্ডাল টেনে হিঁচড়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরি, আজ রিকৃশ নিলুম। তবু লম্বা হাত বাড়িয়ে আষাঢ়ের বর্ষা আমাদের পিছন থেকে ধরে ফেলল। আমি ভিজে গেলুম। এই যে দেখছ আমার জামা কাপড় একেবারে কোঁচকান, এর অন্য কোন কারণ নেই, একেবারে নেয়ে উঠেছিলুম যে।

তাড়াতাড়ি নেমে দাঁড়ালুম একটা ঢাকা বারান্দার নিচে। ভেবেছিলুম মৌশুমী পশলা, দশ মিনিটেই ধরে যাবে। ধরল না। অধীর রিকৃশওয়ালা ঠুনঠুন ঘুন্টি বাজিয়ে ডাকলে, কিন্তু উঠতে ভরসা হ'ল না। পথে তখন হাঁটু-সমান জল দাঁড়িয়ে গেছে। দেখতে দেখতে সারে-সারে ট্রাম দাঁড়িয়ে গেল, বাস দু'চারখানা চলছিল বটে, ভারী ভারী কলের নৌকোর চালে, চাকা যেন স্রোত ঠেলে উজানে চলেছে। ছাতা খুলে একটা লোক ম্যানহোল খুলে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল. আর মাঝে মাঝে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দেখছিল ঝাঁঝরিটায় সত্যিই ফুটো আছে কিনা।

সেই ঢাকা-বারান্দার নিচে দাঁড়ানও কি কম দায় নাকি। তারও ছাত ফাটা, চুইয়ে চুইয়ে চুনসুরকি-গলা জল ঝরছিল, কিন্তু সরে যে দাঁড়াব তার উপায় কই। কয়েক ফুট তো মোটে জায়গা, লোকে-লোকে রুদ্ধশ্বাস। কারও কারও হাতে ছাতা, বাঁট থেকে জল ঝরছে। খবরের কাগজওয়ালা ক্যাম্বিশের কাপড়ে বইপত্তর ঢেকে পাহারা দিচ্ছে, সে দিকে পা বাড়াবার জো নেই। ওরই মধ্যে এক চানাচুরওয়ালা তপ্ত খোলায় চীনাবাদাম ভেজে গরম গরম বিক্রী করছে। হাওয়ায় পোড়া বিড়ির ধোঁয়ার উৎকট গন্ধ। একটা জায়গা নোংরায় গোবরে মাখামাখি, নিরীহ নিশ্চিন্ত একটা ষাঁড় হাঁটু ভেঙ্গে বসে মাছি তাড়াচ্ছে। বাইরে যখন বৃষ্টি,

তখন মাছিদেরও তো একটা আশ্রয় চাই। কোথায় আর যাবে, ডাঁশগুলোর সঙ্গে ষাঁড়টার পিঠের দখলী-স্বত্ব নিয়ে ভনভন করে বিবাদ করুক।

নিশিবাবুকে দেখতে পেলুম তখন। ভীড় ঠেলে ঠেলে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, টের পাইনি। একেবারে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার, কতক্ষণ থেকে। আপনিও আটকে পড়েছেন ?'

প্রথমে চমকে উঠেছিলুম, চেয়ে দেখলুম, নিশিবাবুই বটে। নিশিবাবু না হ'লে কার এমন সাহস হবে যে, প্রথমেই মেয়েদের পিঠে হাত দেয়!

আসলে নিশিবাবুর ধরনটা অমনই। তোমার ছোট আয়নাটা দিয়ে ওঁকে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ ট্যাক্সিওয়ালা, আচ্ছা, ওঁকে কেমন লোক বলে মনে হয় তোমার ? না-না, ওঁর মনের কথা জিজ্ঞাসা করছি না, সে তুমি জানবে কী করে। কিন্তু মুখ তো মনেরই আয়না, মুখ দেখে কী ভাবছ বল, বল না! একটু অদ্ভুত গোছের মানুষ, কেমন ? চুলগুলো অবশ্য লম্বা লম্বা, তাও ভাল করে আঁচড়ান নয়, আর নিশিবাবু বোধহয় সাতজন্মেও চুল কাটেন না। চোখ দু'টি এই আধ-অন্ধকারে তুমি ঠাহর করতে পারছ না, আলো থাকলে দেখতে, ওঁর চোখের মণি দু'টি সকৌতুক, তাতে একটু যেন ছেলেমানুষি মেশান। কিন্তু ভুরু অত্যন্ত ঘন, রন্ধ্র দু'টি বড় বলে নাকের ডগা রীতিমত স্ফীত। দাঁত ভাল নয়, কেননা নিশিবাবু পান খান, আর সিগারেট খুব বেশি খান বলে পুরু পুরু ঠোঁট দু'টি কালচে। ধোঁয়া একেবারে মুখে এসে পড়লে অস্বস্তি হয়, কিন্তু দূর থেকে মন্দ লাগে না। কেমন একটু মিঠেকড়া গন্ধ, নেশা কাকে বলে জানি না, কিন্তু আমার যেন মাথা ঝিমঝিম করে।

সব সময়েই ধোঁয়ার আড়ালে থাকে বলেই ওঁর মুখখানা কখনও স্পষ্ট দেখতে পাইনে। পাইনে বলেই মানুষটাকে বোধহয় এত

রহস্যময় লাগে। লাগে বলেই এত লোকের মাঝখানে ভদ্রলোক পিঠে হাত দিলেও রাগ করতে পারিনে। জানি, উনি অমনই। কোন্‌টা দেখতে ভাল, কোন্‌টা দৃষ্টিকটু সে-সব বোঝেনই না, মানবেন কোথা থেকে।

মুখটায় ছেলেমানুষি থাকলে কি হবে, নিশিবাবুর কাঁধ কী চওড়া দেখছ তো। কোলের উপরে রাখা হাত দু'টিও বেশ রোমশ আর শক্ত, কব্‌জিতে ভীষণ জোর। আমার ত ভয় হয়, ওঁকে বিশ্বাস নেই, যদি কখনও ধরেন তবে আমার হাত দেশলাইয়ের কাঠির মত মট করে ভেঙ্গে যাবে। ভাবছি, ভয় হচ্ছে আর ঘামছি।

গুণ্ডার মত যার গায়ের জোর, তার গলায় গান আছে, কখনও শুনেছ। সত্যিই আছে। বেশ দরাজ গলা, কিন্তু ভারী মিষ্টি। আমি শুনেছি যে। মিনিকে উনি গান শেখাতেন। আমার খুড়তুতো বোনকে।

শেখাতেন বললুম বটে, কিন্তু শেখান বলতে যা বোঝায়, ঠিক সে-ভাবে নয়। কোন পদ্ধতি মেনে ধৈর্য ধরে শেখান, সে ওঁর ধাতেই নেই। আসতেন, সপ্তাহে দু'দিন করে, সন্ধ্যার দিকে। এসেই বাটাভরা পান সাজাই থাকত, দু'টি খিলি তুলে একসঙ্গে মুখে পুরতেন, আয়েস করে ধরাতেন সিগারেট। রীড টিপে টিপে হারমনিয়ামে সুর-সঙ্গতি আনতেন। তারপর ওঁর গলা খুলত। গান গেয়ে যেতেন, একটার পর একটা। ছাত্রী কতটা শিখল না শিখল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না। মিনি ভয়ে ভয়ে, জড়োসড়ো হয়ে যতটুকু পারে তুলে নিত।

তুলে নিতুম আমিও, আড়াল থেকে। সামনে যেতুম না ত।

একদিন ধরা পড়ে গেলুম। স্নান করে এসে বারান্দায় কাপড় মেলছি, গুনগুন গানও চলছে, হঠাৎ দেখি নিশিবাবু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

বললেন, 'আপনিও গান জানেন নাকি।'

মাথা নিচু করে বললুম, 'কই না।'

মিনিটা ফস করে বলে উঠল, 'জানে নিশিদা। ওর গলাও খুব মিষ্টি।'

ওকে চিমটি কেটে থামিয়ে দিলুম। আড়ষ্টভাবে বললুম, 'এই মাঝে মাঝে শখে পড়ে—'

কথাটাকে নিশিবাবু আর পুরো হতে দিলেন না। কিছুটা অসহিষ্ণু, কিছুটা রূঢ় ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'এ তো শখের জিনিস নয়, গান হ'ল সাধনার।'

সেদিন তাড়াতাড়ি পালিয়ে বাঁচলুম।

তারপরেও দু-চার দিন সামনা-সামনি পড়ে গেছি, উনি হয়ত একটু হেসেছেন, আমি হাসতে পারিনি, এবং কুণ্ঠায় লজ্জায় আরও জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছি।

তারপর ত আমার বিয়েই হয়ে গেল।

মিনিটা খুব দুষ্টু ত, বিয়ের পরেও ওঁর নামে নানা বাজে কথা বানিয়ে বলত। নিশিবাবু নাকি গাইতে এসে এদিক-ওদিক চাইতেন।—'তোমার ছোড়দি আর আসেন না, না?'

'ওদের বাসা অনেক দূরে যে।' মিনি বলত।

'ও', বলে নিশিবাবু নাকি হারমোনিয়ামটা টেনে নিতেন, এত জোরে টিপতেন রীড, যে বাজনাটা ত্রাহি ডাক ছাড়ত।

এর কিছুদিন পরে নিশিবাবু মিনিকে গান শেখান ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মিনি বলত, 'জানিস ছোড়দি, তোর জন্যে। তুই নেই বলে।'

এত বোকা নই যে, ওর কথায় বিশ্বাস করব। ও আমাকে শুধু খ্যাপাত। তা-ছাড়া আমি জানতুম যে, নিশিবাবু নিজেও বিবাহিত, তখনই ওঁর দু'টি ছেলে। গান শেখান উনি বন্ধ করেছিলেন অন্য কারনে। একটা ফিল্‌ম কোম্পানীতে ভাল কাজ তখনই পেয়ে যান। গান সেখানর সময় বা প্রয়োজন কোনটাই তখন তাঁর ছিল না।

তারপর নিশিবাবুর সঙ্গে আর একবারই দেখা হয়েছে, এই ত সেদিন, এক জলসায়।

ভেবেছিলুম চিনতে পারবেন না, কিন্তু পারলেন। নমস্কার করলেন, হাসলেনও। দেখলুম, সেই ছটফটে ভাব ষোল আনা আছে। চপল অথচ মাঝে মাঝে উদাস, বাক্‌পটু, তবু কখনও কখনও অকারণে গম্ভীর।

সেদিন কথায় কথায় অনেকক্ষণ জমিয়ে রাখলেন। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে একবার বললেন, 'আপনার চেহারা একটুও বদলায়নি দেখছি। বাচ্চা টাচ্চা কিছু হয়নি বুঝি ?'

আমার মাথা কাটা গেল। এসব কথা কোন অল্প-চেনা মেয়েকে কেউ কি সবার সামনে, এমন কি আড়ালেও বলে ?

ভাগ্যিস মোড়ে মোড়ে লাল আলো জ্বলছে আর নিভছে, এখনও পথে জল, আর পোকার সারির মত মিছিল দিয়ে গাড়ি চলেছে, এখন রিক্‌শ বল, মোটর বল, সবাই সমান। সকলেই হাঁটি-হাঁটি পা-পা। সময় মিলল বলেই তোমাকে এত কথা বলতে পারলুম।

এবার—আজকে কী ঘটল, বলি।

সেই ঢাকা বারান্দায় একটু একটু করে জল ঝরছে, ভীড় বাড়ছে। গোড়ালির কাছে শাড়িটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল, টের পেয়েছি কিছু করবার উপায় নেই।

নিশিবাবু এখনও আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। আড়ষ্ট বোধ করছিলুম, কিন্তু ওকে সরতে বলতেও ত পারিনে। আর সরাবনই বা কোথায়, রাস্তায় গিয়ে এক হাঁটু জলে গিয়ে দাঁড়াবেন ? তা-ছাড়া দেখ, উনি না-হয় সরলেন, কিন্তু জায়গা ত খালি থাকত না, হুড়মুড় করে অন্য লোক এসে পড়ত। নিশিবাবু বললেন, 'এ কী আপনার মাথা একেবারে শাদা হয়ে গেল কী করে ! এত কি চুল পেকেছে ?'

চমকে তাড়াতাড়ি মাথায় হাত দিলুম। খানিকটা খড়িগোলা জল ওঠে এল। এতক্ষণ ফাট চুইয়ে আমার মাথাতেই পড়ছিল।

আয়না আমার সঙ্গেই আছে, চিরুনিও, কিন্তু ওখানে বার করি সাধ্য কী। নিরুপায় হয়ে সেকেলে ঘোমটাই তুলে দিতে যাচ্ছি, নিশিবাবু করলেন কী, পকেট থেকে রুমাল তুলে আমার চুলে ঘষে দিলেন।

সেই এক-বারান্দা লোকের মাঝখানে। সিঁথি, কপাল, কানের লতি কিছুই বাকী রাখলেন না। নাগের ডগাতেও রুমাল ছোঁয়াতে যাবেন, আমি জোর করে ওঁর হাতটা ঠেলে দিলুম। চাপা গলায় বললুম, 'করছেন কী, আপনার কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি।'

নিশিবাবু হেসে উঠলেন। আমি তখন ভয় পেলুম। লোকটা হয় বদমাস, নয়ত একেবারে শিশু।

সকলে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। কৌতুক, কৌতূহল, সন্দেহ, তিরস্কার—সমবেত দৃষ্টিতে সবই ছিল। এর চেয়ে ঠায় জলে দাঁড়িয়ে ভিজলে এমন কি এসে যেত।

কিন্তু নিশিবাবুই বাঁচালেন। বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে কী হবে, এই বারান্দাটার ঠিক ও-পাশেই একটা চায়ের দোকান আছে, চলুন বসি।'

সেখানে যেতেও ভিজতে হয়, তবু আপত্তি করলুম না। কেননা, ওখানে দাঁড়ান আর সম্ভব ছিল না ; একবার শুধু বললুম, 'আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, আমার স্বামীর জন্যে ওষুধ কেনাও বাকী আছে। তা-ছাড়া একটা রিক্‌শওয়ালাকে সেই থেকে বসিয়ে রেখেছি।'

নিশিবাবু রিকশওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। ঝরঝর জল ঝরছে, আমাকে একরকম টেনে পাশের চায়ের দোকানে নিয়ে তুললেন।

ছোট একটা খুপরি খুঁজে আমরা বসলুম। আমার পা তখন কাঁপছিল।

হাওয়াটা জোলো, কিন্তু শুধু সেজন্যই নয়। উত্তেজনাতেও। একটুকু আসতেই আমরা জলে ভিজেছিলাম, নিশিবাবু শক্ত করে

আমার হাত ধরে রেখেছিলেন—একসঙ্গে বৃষ্টিতে ভেজার মত ঘটনা দু-জন মানুষকে কত কাছাকাছি আনতে পারে, ট্যাক্সিওয়ালা, তুমি জান না।

চলকে পড়া চায়ের আর মাংসের ঝোলের হলুদ ছোপ-লাগা টেবিল ঢাকনি, কাচের একটা ফুলদানী, খুপরিটা এমন কিছু চোখে ধরবার মত নয়। তবু আমার ভাল লাগছিল, ভীষণ ভাল লাগছিল। খুপরিটা ছোট, নিতান্তই ছোট, ছোট বলেই বুঝি অত ভাল। কড়া একটা আলো জ্বলছে, পাখা চলছে, তবু মনে হ'ল, ঘরটা গরম, আমাদের দু'জনের নিশ্বাসেই যেন ভরে উঠেছে।

নিশিবাবু বললেন, 'কী খাবেন ?'

রুদ্ধগলায় শুধু বলতে পারলুম, 'এক গ্লাস জল।'

উনি হাসলেন।—'জল ? এই ঠাণ্ডায় ? শুধু জল ?' বেয়ারাকে ডেকে কিছু খাবারেরও ফরমাস করলেন।

পাশের ঘরে আরও যেন কারা আছে, টের পাচ্ছিলুম। ওরা চাপা-গলায় কথা বলছে। মাঝে মাঝে হাসছে। আমরা কথা বলছি না। আমরা হাসছিও না। আমরা চুপ করে শুনছি। কোথায় কে যেন একটা চামচ পেয়ালায় ঠুকে গৎ তুলছে। রেডিওটায় খুব নিচু পর্দায় চটুল একটা বিদেশী সুর বাজছে, জানলায় বৃষ্টির টুপটাপ, একটা ডিশ মাটিতে পড়ে গিয়ে খান খান হয়ে গেল, সব শব্দ আমরা শ্রুতি দিয়ে কুড়িয়ে চেতনার সাজি ভরে তুলছি।

আবেশে আমার চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল। সামনে-রাখা চায়ের পেয়ালা থেকে ধোঁয়া উঠছে। কিন্তু চায়ের পেয়ালাটা কিছু না। সমস্ত পরিবেশটাই তখন আমার কাছে একটি টলমল পানীয়ের আধার হয়ে উঠেছে।

নিশিবাবু একবার সিগারেট ধরালেন। এতক্ষণ যেন ছোঁয়া-না-ছোঁয়ার সীমানায় দাগটার উপরে দাঁড়িয়েছিলেন, মনে হ'ল, হঠাৎ যেন একটু দূরে গিয়ে একটু অচেনা হয়েছেন।

বুঝিয়ে বলা যাবে না এমন একটা অনুভূতির সুখে আমার মনের ভিতরটা ফুটছিল। আমার চোখে ফোঁটা-ফোঁটা কান্না

জমছিল। জান ত, কেটলির ভিতর জল যখন উথলে ওঠে, আর ঢাকনা তখন থরথর করে কাঁপে, বাষ্পে ঝাপসা হয়ে যায়।

আমার হাত টেবিলের উপরে ছিল। আমি কাঁপছিলুম। উনি আস্তে আস্তে সেখানে হাত রাখলেন। বিশ্বাস কর, মাত্র ওইটুকুই। বোধহয় এক মিনিট সময় কাটল। কিংবা মিনিটখানেকও না। চোখ বুজে, দাঁতে ঠোঁট চেপে কোনমতে, নিজেকে ধরে রেখেছিলুম। আমার আঙুল গলছিল। তারপর আমি চোখ মেলে চাইলুম; গলেগলে যাওয়া আঙুলগুলোয় সমস্ত শক্তি আর ইচ্ছা আর দৃঢ়তা জড়ো করে হাত টেনে নিলুম। অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলুম, 'না।'

হাত সরিয়ে নিলেন উনিও। আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'সেই ভাল। না। না-ই ভাল।'

বৃষ্টি ধরে এসেছে। আমরা বাইরে এসে দেখি, বারান্দাটা ফাঁকা। বললুম, 'বড় দেরি হয়ে গেল।'

উনি বললেন, 'বাসায় পৌঁছে দিই?'

তুমি দাঁড়িয়েই ছিলে, প্রত্যাশী দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইছিলে। উনি তোমাকে হাত তুলে ডাকলেন। নিচু গলায় আমাকে বললেন, 'শুধু একটি অনুরোধ। সোজা বাসায় যাব না। একটু ঘুরব শুধু—মাঠে কিংবা গঙ্গার ঘাটে।'

আমি ইতস্তত করছি দেখে, হাসলেন।—'ভয় নেই। কোন অন্যায় সুযোগ নেব না। সব ধুলো ময়লা ধুয়ে, জ্বালা জুড়িয়ে সন্ধ্যাটা কী সুন্দর হয়ে উঠেছে দেখুন। এই সন্ধ্যাকেই আরও কিছু সময় বাঁচিয়ে রাখতে দোষ নেই।'

তারপর, ট্যাক্সিওয়ালা, আরও আধ ঘণ্টা ধরে আমরা শুধু ঘুরলুম। তোমার সামনে আয়না আছে, তুমি সাক্ষী, আমরা সত্যই কোন দোষ করিনি।

কচি ঘাসের আঁচলে কালো পিচের পাড়, আর গ্যাসের স্নিগ্ধ আলোর চুমকি—ভিজে জ্যোৎস্নায় স্নান সেরে মাঠটা এই ঘিঞ্জি,

চীৎকারে-ভরা শহরের সঙ্গে সব আত্মীয়তা যেন অস্বীকার করে বসেছে। তোমার নিজেরও কি ভাল লাগেনি?

আমাদের লেগেছিল। পিছনের সীটে, দু'টি ধার ঘেঁষে আমরা দু'জন বসেছিলুম, মাঝখানে অতি সুকুমার একটি ছায়া-ছায়া অন্ধকার আর একটুখানি ভাল লাগাকে রেখে। ওরা দু'টি যেন যমজ শিশু, আমাদেরই দু'জনের যৌথ সৃষ্টি।

গঙ্গার ধারেও অল্প একটু সময়ের জন্যে নেমেছিলুম। তখন বৃষ্টি নেই, কিন্তু চাঁদ-চোয়ান শিশির আছে। দূরে দূরে অশ্বত্থ গাছ, গড়ের ভুতুড়ে ঢিবি, আর আছে-কি-নেই এমন বিজলী আলো।

একটা থামের পাশে ছোট একটি ছেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। হাতে কয়েক ছড়া মালা। আজ সারা সন্ধ্যা বৃষ্টি গেছে, এদিকে লোক বেশি আসেনি, ওর বিক্রী ভাল হয়নি। মালা ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, ফুল বাসী হবে।

নিশিবাবু দু'ছড়া মালা কিনলেন। দু'টোই একই সঙ্গে জড়িয়ে দিলেন আমার খোঁপায়।

একে অসংযম বলতে চাও বল।

সেই মালা থেকে আমি আলগোছে কয়েকটি ফুল খসিয়ে নিলুম। ওর হাত পাতাই ছিল, সেখানে নিঃশব্দে তুলে দিলুম।

ট্যাক্সিওয়ালা, আমাদের গলিটা এসে পড়েছে এবার ডাইনে ঘোর! ওই যে দেখছ জানলায় আলো জ্বলছে, ওই ঘরটাই আমাদের। আমার স্বামী জেগে। বাস, আর নয়, এবারে থাম। আমি এইখানেই নামব।

[তিন]

কন্‌ডাক্‌টর লেডিজ সীটটা খালি করে দাও, আমি একটু বসব। এখন এত রাত, দশটা বাজে-বাজে, তবু তোমাদের বাসে এত ভীড়?

এই যে, পাঁচ পয়সা ভাড়া নাও। বেশি দূরে নয়, আমি ওই চৌরাস্তা অবধি যাব। বড় ওষুধের দোকানটা রাত্রেও খোলা থাকে। এ পাড়ারগুলো কখন বন্ধ হয়ে গেছে।

ওষুধ আমাকে আজ কিনতেই হবে। আমার স্বামীর জন্যে। আগেই কেনা উচিত ছিল, তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরার কথা ছিল। কিন্তু কী সর্বনেশে বৃষ্টি নামল, কোথা থেকে কী হয়ে গেল, না হ'ল ওষুধ কেনা, না তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরা। সব ভুল হয়ে গেল।

কী হয়েছিল জিজ্ঞাসা ক'র না। আমি বলতে পারব না। আমার ঘরের লোককেই বলতে পারিনি তুমি ত পর।

বাসায় ফিরতে আমার খুব দেরি হয়েছিল। দেখি, ঘরে আলো জ্বালা, স্বামী চুপ করে চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে। ঘুমোয়নি, আমি জানি, ভান করেছে। বালিশের পাশে হাতঘড়ি. ওটা আসলে আমার স্বামীর চর, ওটাকে টিপে দম বন্ধ করে মারতে পারলে আমার গায়ের জ্বালা মেটে। টিকটিক করে আমার স্বামীকে কানে কানে বলছে, রাত ন'টার কাটা পার।

কাপড় ছাড়বার সময় হ'ল না, ওর শিয়রে এসে দাঁড়ালুম। একটা হাত রাখলুম ওর কপালে। এক ঝটকায় ও আমার হাত সরিয়ে দিলে। এই তোমার ঘুম ?

তবু বললুম, 'ব্যথাটা বেড়েছে ?'

ও এবার পিটপিট করে তাকাল। আগাগোড়া দেখল আমাকে দেখল, শাড়িটা ভিজে ভিজে খোঁপা গোড়ে মালা।

খুব বিশ্রী ধরনে হাসল।

আবার বললুম, 'ব্যথাটা খুব কি বেড়েছে ?'

ও পাশ ফিরে শুল। এই ভঙ্গিটার মানে আমি জানি। মানে : থাক থাক, দরদ দেখিয়ে কাজ নেই।

ভয়ে ভয়ে কৈফিয়ৎ দেবার মত করে বললুম, 'বৃষ্টি হ'ল, তাই অনেকক্ষণ আটকে পড়েছিলুম।'

ও-পাশ ফিরেই ও হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা টেনে নিল। কানের উপরে রাখল কিছুক্ষণ। ঘরঘরে গলায় বলল, 'এখন সওয়া ন-টা। এখানে বৃষ্টি থেমেছে ঠিক সাড়ে সাতটায়। তুমি বুঝি অন্য কোন শহরে গিয়েছিলে।'

এটা আসলে খোঁচা। এর উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই। দাঁড়িয়ে ভিজে আঁচলের কোণ আঙুলে জড়াতে থাকলুম। দেয়ালের ঝুল কতদিন পরিষ্কার করা হয়নি। একটা কড়িকাঠ ঘুণে খেয়ে ঝুরঝুরে হয়েছে। জানলার নিচে খানিকটা আস্তর খসেছে। বাড়িওয়ালাকে বলতে হবে। নর্দমার ঝাঁঝরিটাও ফাঁক হয়ে আছে, আরশোলা আনাগোনা করে। কাল বন্ধ করে দেব। টিকটিকিটা ওই এক-রত্তি পোকাটার নাগাল পেল না? পোকাটা আলোর ডুমটায় বসেছে। এবারে ওর পাখা পুড়বে। উপরে আলোর ডুম, নিচে টিকটিকি। আজ পোকাটার কপালে নির্ঘাত মরণ।

দেখি, কখন আমার স্বামী আবার এ-পাশ ফিরে শুয়েছে, নির্নিমেষ চোখে দেখছে আমাকে। আমার খোঁপার মালাকে।

আমি করলুম কী, খুলে নিলুম মালা। বললুম, 'ভারী সুন্দর গন্ধ না? ভাল লাগল তাই দু' ছড়া কিনেছি। তুমি একটা নাও।'

একটা মালা ছুঁড়ে দিলুম ওর বিছানায়।

মালাটা ও ছুঁলও না। ছোঁবে কি, শক্ত মুঠোয় হাতঘড়িটা চেপে আছে যে।

অনেকক্ষণ পরে থমথমে সুরে বলল, 'আমার ওষুধটা এনেছ? দাও।' বলেই হাত বাড়িয়ে দিল।

এবার আমি অপ্রস্তুত, আপাদমস্তকে কেঁপে উঠলুম। ওষুধের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছি?

ক্ষীণস্বরে বললুম, 'আজই চাই?'

ও শুকনো কঠিন গলায় বলল, 'না। আজই অবশ্য চাই না। আমি একবারেই মরব না। যদি তাই ভেবে থাক, তবে চালে ভুল করেছ।' বলে হাতঘড়িটা নামিয়ে রাখল। তুলে নিল মালাটা। দেখলুম, ফুলগুলো ছিঁড়ছে; একটি একটি করে ফুল ছিঁড়ে প্রতিটি পাপড়ি খসিয়ে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী নিয়ে চটকে ফেলে দিচ্ছে।

তারপর সব ফুল ছেঁড়া, সব পাপড়ি থেঁতলান সারা হ'লে আবার পাশ ফিরল, গোঙাতে থাকল যন্ত্রণায়। ওর মনে যন্ত্রণা, যন্ত্রণা ওর শরীরে। মনে হ'ল কাঁদছে।

কন্‌ডাকটর, তখন আমারও চোখে জল এসেছিল। বাইরে বেরিয়ে এলুম, নামলুম সিঁড়ি দিয়ে। নিজে কষ্ট পায় ও আমাকে কষ্ট দেয়। ওর যন্ত্রণা আমি একেবারে সহ্য করতে পারিনে। চাই, ও সেরে উঠুক। আমি যে ওকেও ভালবাসি।

এ-কথা ও বুঝবে না, বিশ্বাস করবে না। ও ভাবে, বাইরের মোহেই বুঝি আমার চোখে ঘোর লেগেছে।

অস্বীকার করব না, লেগেছে। ভাল লেগেছে আজকের বৃষ্টি-ধোয়া বিকেল, সেই চায়ের দোকান, রাতের গঙ্গা। কিন্তু তবু অনেক সুরের খেলা অনেক স্বরবিস্তারের পর গান যেমন সমেই ফিরে ফিরে আসে, আমিও তেমনিই আমার স্বামীর ঘরে এসে থেমেছি। ঘরের মায়া আর ঘাটের মোহ, আমার কাছে দুই-ই সত্যি। সন্ধ্যায় একজনের দেওয়া ফুল মাথায় পরেছি, রাতে তাই আবার দিতে চেয়েছি স্বামীকে। ফুল নেওয়া আর দেওয়া, কোনটাই কিন্তু অভিনয় নয়।

অভিনয় হ'লে কি ওরই জন্যে ওষুধ কিনতে এত রাত্রে আবার পথে বেরিয়ে আসি?

* * * *

চৌরাস্তা এসে পড়েছে। দোকানটা এখানেই। কনডাকটার, জেনানা নামছে, একদম বেঁধে।